# KRISHI-SIKSHA.

BEING A TREATISE

ON

INDIAN AGRICULTURE

WITH THE

MODERN VIEWS ON THE SUBJECT.

BY

KALIMAY GHATAK.

*THIRD EDITION.*

Calcutta:

PUBLISHED BY THE SANSKRIT PRESS DEPOSITORY,
148 BARANASI GHOSH'S STREET.

PRINTED BY T. C. ASH, AT THE VICTORIA PRESS
2, GOABAGAN STREET.

1892.

# বিজ্ঞাপন।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিনটীই অর্থোপার্জ্জনের প্রশস্ত উপায়। তন্মধ্যে কৃষিই মানব জাতির অগ্রে অবলম্বনীয়। কারণ কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্যের মূল এবং অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধনে আবদ্ধ হইতে পারে। ভারতবর্ষের অধিকাংশ লোক মূলধন বিহীন এবং ভারতীয় কৃষির অবস্থা অত্যন্ত হীন। অধিকন্তু এ দেশে বহু দিন হইতে দ্রব্যাদি দুর্মূল্য হওয়ায় লোকের অতিশয় ক্লেশ হইয়াছে। চাকরীও নিতান্ত ক্লেশকর ও দুষ্প্রাপ্য হইয়া উঠিয়াছে। এমত স্থলে কৃষির উন্নতি বিধান করিয়া দেশের উৎপন্ন বৃদ্ধি করা ভিন্ন উপরি উক্ত ক্লেশ নিবারণের এবং বাণিজ্যাদি অবলম্বনার্থ মূলধন সংস্থানের উপায়ান্তর নাই। এই জন্যই আমি "কৃষি-শিক্ষা" নামে এই পুস্তক প্রকাশ করিলাম।

"কৃষি-শিক্ষার" বিষয় সকল অনেক দিনব্যাপী বহু অনুসন্ধান ও বহু পরীক্ষা দ্বারা সংগ্রহ করিয়াছি। তদ্ব্যতীত কোন কোন বিষয়ে ওব্রাইন্ স্মিথের নব পঞ্জিকা, আর্থর হেন্‌রব কিমি[illegible] অব্ এগ্রিকাল্‌চার, মুরসিদাবাদের জিওগ্রাফিক্যাল্ চার্ট, হণ্টার সাহেবের ষ্টাটিষ্টিক্যাল্ য্যাকাউন্ট, শ্রীনাথ দত্ত সম্পাদিত ব্যবসায়ী, ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্রের শিল্পিক দর্শন, হরিমোহন মুখোপাধ্যায়ের কৃষিদর্পণ, প্যারীচাঁদ মিত্রের কৃষিপাঠ, ডাক্তার যদুনাথ মুখোপাধ্যায়ের উদ্ভিদ্ বিচার, উমেশচন্দ্র সেন গুপ্তের [illegible] কৃষিচন্দ্রিকা, পরাশর সংহিতান্তর্গত কৃষিপরাশর [illegible] পুস্তক ও পত্রিকা হইতে [illegible]

বিগত কয়েক বৎসর হইতে এদেশীয় কৃষির প্রতি গবর্ণমেণ্টের দৃষ্টিপাত লক্ষিত হইতেছে। অতএব এই পুস্তক খানি কোন না কোন সময়ে স্কুলপাঠশালার পাঠ্য রূপে পরিগণিত হইবারও সম্ভাবনা আছে। আমি এই বিবেচনায় বিবিধ বৈজ্ঞানিক যুক্তি দ্বারা ইহার অন্তর্গত বিষয় সকলের সমর্থন করিবার চেষ্টা করিয়াছি।

কৃষিশিক্ষার পাণ্ডুলিপি প্রস্তুত হইলে শ্রীযুক্ত বাবু ভূদেব মুখোপাধ্যায় মহাশয়কে দেখাইয়াছিলাম। তিনি উহা পাঠ করিয়া নিম্নলিখিত অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করেন;—

"At the request of the writer Babu Kalimay Ghatak I have looked into his *Krishi-Vigyan* * and I am of opinion that it might be made a very useful work in our Middle Vernacular and Intermediate Schools But I must say that it needs very careful revision both as regards its matter as well as its style."

অনন্তর আমি ভূদেব বাবুর ঐ অভিপ্রায়ের সহিত পাণ্ডুলিপি প্রেসিডেন্সী বিভাগের ইন্‌স্পেক্টর শ্রীযুক্ত এ, ডবলিউ, ক্রফট্ সাহেব মহোদয়ের নিকট প্রেরণ করি। তিনি উহা শ্রীযুক্ত ডাক্তার রাজেন্দ্রলাল মিত্র মহাশয়কে দেখিতে দেন। রাজেন্দ্র বাবু তৎকালীন পাণ্ডুলিপির কোন কোন দোষের উল্লেখ করেন, এবং উহার 'সার ও 'পাইট বিষয়ক পাঠ দুইটীকে অপেক্ষাকৃত বিস্তৃত করা আবশ্যক, এই রূপ [illegible] করেন।

* "কৃষিবিজ্ঞান" ছিল।

আমি ভূদেব বাবু ও রাজেন্দ্র বাবুর অভিপ্রায় অনুসারে পাণ্ডুলিপির নানা স্থানে পরিবর্ত্তন ও পরিবর্দ্ধন, বিশেষতঃ উহার অন্তর্গত 'সার' ও 'পাইট' বিষয়ক পাঠ দুইটী বিস্তৃত করিয়া পরিশেষে সুবিখ্যাত উদ্ভিদ্ ও রসায়নবিৎ ডাক্তার শ্রীযুক্ত বাবু যদুনাথ মুখোপাধ্যায় মহাশয়ের হস্তে সংশোধনার্থ পাণ্ডু-লিপি অর্পণ করি। তিনিও যথোচিত যত্ন ও উৎসাহ সহকারে আদ্যোপান্ত পাঠ ও সংশোধন করিয়া নিম্নলিখিত অভিপ্রায় লিপিবদ্ধ করিয়াছেন,—

"It gives me much pleasure to say that I at the request of the author went through the manuscript and carefully revised both the matter and style.

"I am of opinion that "Krishi Siksha" will make a very useful school-book and that the general readers will derive much practical knowledge about cultivation by reading it."

এই গ্রন্থে যে সকল বিষয়ের প্রসঙ্গ করিয়াছি, মাত্র গ্রন্থ পাঠে তদ্বিষয়ক সম্যক্ জ্ঞান লাভের সম্ভাবনা নাই; তাহাতে উপযুক্ত রূপ পরীক্ষার প্রয়োজন আছে। যাঁহারা কৃষি বিষয়ে অভিজ্ঞতা লাভ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহা-দিগকে গ্রন্থের লিখিত উপদেশানুসারে সবিশেষ অভিনিবেশ সহকারে সমস্ত শস্যাদির উৎপত্তি ও পরিণাম প্রত্যক্ষ করিতে হইবে। যেহেতু বিশেষ বিশেষ দেশ-কাল-পাত্র-সংযোগে উদ্ভিজ্জের উৎপত্ত্যাদির বৈষম্য হইয়া থাকে। যাহা হউক, কৃষি শিক্ষাকে সর্ব্ব সাধারণের পাঠোপযোগী ও ফলোপধায়ক

করিবার জন্যও আমি যথেষ্ট শ্রম ও যত্ন করিয়াছি। বহুকাল হইতে নিরক্ষর কৃষক-মণ্ডলীর হস্তে ন্যস্ত থাকায় এ দেশীয় কৃষির যেরূপ শোচনীয় অবস্থা উপস্থিত হইয়াছে, সুশিক্ষিতগণের মনোযোগ ব্যতিরেকে তাহার উন্নতির কিছুমাত্র সম্ভাবনা নাই। যদি কৃষি-শিক্ষার দ্বারা অস্মদ্দেশীয় হীনাবস্থ কৃষির প্রতি শিক্ষিত সমাজের দৃষ্টি পতিত হয়, আমি তাহাতেই আমার সমস্ত শ্রম ও যত্ন সফল জ্ঞান করিব।

রাণাঘাট বঙ্গবিদ্যালয়। } শ্রীকালীময় ঘটক।
১৪ চৈত্র। ১২৮৫।

## দ্বিতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

দ্বিতীয় সংস্করণে কৃষি-শিক্ষার নানাস্থান বিশেষ যত্নের সহিত সংশোধিত, পরিবর্ত্তিত ও পরিবর্দ্ধিত হইয়াছে। বিশেষতঃ ১২৮৬ সালে আমি যখন পাইকপাড়া নরসারি হইতে প্রকাশিত "কৃষিতত্ত্বের" সম্পাদক ছিলাম, ঐ সময়ে নিজে অনুসন্ধান করিয়া যে সকল বিষয়ের বিবরণ সংগ্রহ ও কৃষিতত্ত্বে প্রকাশ করি, কৃষি-শিক্ষার দ্বিতীয় সংস্করণে তন্মধ্যে কোন কোন বিষয় পুনর্মুদ্রিত করিলাম।

রাণাঘাট ইংরাজী-বঙ্গ বিদ্যালয়। } শ্রীকালীময় ঘটক।
১৫ চৈত্র। ১২৯২।

# তৃতীয় বারের বিজ্ঞাপন।

ত্রয়োদশ বর্ষ পূর্ব্বে যে আশা করিয়া "কৃষি-শিক্ষার" প্রণয়ন করিয়াছিলাম, এত দিনের পর তাহা সফল হইয়াছে। বঙ্গদেশীয় সাধারণ শিক্ষার ডিরেক্টার্ সাহেব বাহাদুর "কৃষি-শিক্ষাকে" স্কুল পাঠশালার পাঠ্যরূপে প্রচার করিয়াছেন, এবং সাধারণেও আনন্দ ও আগ্রহ সহকারে কৃষি বিষয়িণী শিক্ষা গ্রহণে উদ্যত হইয়াছেন। তজ্জন্য আমি বিশেষ যত্নে "কৃষিশিক্ষার" নূতন সংস্করণ প্রকাশে প্রবৃত্ত হইলাম।

"কৃষিশিক্ষার" অন্তর্গত কয়েকটী পাঠের বিশিষ্ট সংস্কার আবশ্যক; কিন্তু দ্বিতীয় সংস্করণের সমস্ত পুস্তক এক কালে নিঃশেষ হওয়ায় পাঠার্থী বালকগণের পাঠের ব্যাঘাত শঙ্কায় অতি সত্বর তৃতীয় সংস্করণ প্রকাশ করিতে হইল। সুতরাং অতি অল্প সময়ের মধ্যে সংস্কারার্হ পাঠ কয়টীর সংস্কার করিয়া উঠিতে পারিলাম না; তৎপরিবর্ত্তে কয়েকটী প্রয়োজনীয় নূতন পাঠ সংযোজন পূর্ব্বক অল্প সংখ্যায় তৃতীয় সংস্করণের পুস্তক প্রকাশ করিলাম এবং সর্ব্বাঙ্গ সম্পূর্ণ করিয়া সমস্ত পুস্তকের চতুর্থ সংস্করণ সত্বর প্রকাশে উদ্যোগী হইলাম।

তৃতীয় সংস্করণে "কৃষি-শিক্ষার" পরিমাণ কিঞ্চিৎ অল্প হওয়ায় উহার মূল্যও অল্প অর্থাৎ আট আনার স্থলে ছয় আনা করিয়া দিলাম।

কলিকাতা।<br>
৯২ নং বহুবাজার ষ্ট্রীট।<br>
১ লা মাঘ, ১২৯৮।

শ্রীকালীময় ঘটক।

# সূচি।

# কৃষি-শিক্ষা।

## দ্বিতীয় নীতি।

"—তদর্দ্ধং কৃষিকর্ম্মণি—"

## প্রথম পাঠ।

### কৃষিকার্য্য কি ?

তরু, গুল্ম, লতা, শৈবাল, ছত্রাক ইত্যাদিকে উদ্ভিদ্ কহে ইহা প্রায় সকলেই অবগত আছেন। উদ্ভিদ্‌গণ মৃত্তিকা, জল ও বায়ু হইতে রসাকর্ষণ করিয়া এবং সূর্য্যকিরণ সংযোগে প্রধানতঃ পত্র দ্বারা সেই রসের পরিপাক করিয়া জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদ্ দ্বারা জন সমাজের অধিকাংশ কার্য্য চলিয়া থাকে। উদ্ভিদ্ ছাড়িয়া মানুষের এক দিন চলে না। আমাদের অন্ন, আচ্ছাদন ও আবাস, উদ্ভিদ্ ভিন্ন তাহাদের কিছুই হইতে পারে না। পৃথিবীর অধিকাংশ লোকের প্রধান আহারীয় উদ্ভিদ্ হইতে জন্মে। চাউল, দাউল, গম, ভূট্টা ইত্যাদি। এতদ্ব্যতীত উৎকৃষ্ট ফল, মূল, তরকারি সকলই উদ্ভিজ্জ। উদ্ভিদ্ ও খনিজ

পদার্থের সংযোগে সংসারের প্রায় সমস্ত দ্রব্যই প্রস্তুত হয়। যথা,—ঘরের দুয়ার, জানালা, কড়ি, বরগা, রুয়া, শাঁড়ক, বাকারি, শলা, খড়, সিন্দুক, বাক্স, তক্তাপোস, লাঙ্গল, কোদাল, খন্তা, মই, দড়ি, দড়া, নৌকা, গাড়ি, সূত্র, বস্ত্র, লেপ, বালিস, মাদুর, থলে, পিঁড়ি, খৈল, বিচালি, কাগজ, কলম ইত্যাদি। যে প্রণালী দ্বারা এতাদৃশ প্রয়োজনীয় উদ্ভিদ্ সকলকে উপযুক্ত রূপে উৎপন্ন করা যায় তাহার নাম কৃষিকার্য্য।

পরমসুখের সামগ্রী যে ফল ও ফুলের বাগান, তাহা কৃষি-কার্য্য ভিন্ন উৎপন্ন হইতে পারে না। মৃত্তিকার উদ্ভিদ্-উৎপাদিকা শক্তিই, এই কৃষিকার্য্যের মূল। আমরা সংস্কার দোষে মৃত্তি-কাকে অতি সামান্য পদার্থ জ্ঞান করিয়া থাকি। কোন পদার্থকে সামান্য বলিতে হইলে মাটির সঙ্গে তুলনা করি। কিন্তু মাটিই যে, আমাদের সর্ব্বস্ব তাহা একবারও ভাবি না। যে সকল কার্য্য কেবল মনুষ্যের ক্ষমতায় সম্পন্ন হয়, তাহাতে আমরা শীঘ্র শীঘ্র আশানুরূপ ফল দেখিতে পাই। কিন্তু কৃষিকার্য্যে সেরূপ ঘটে না, ইহাতে সময় ও মাটির উৎপাদিকা শক্তির উপর অধিক নির্ভর করিতে হয়। মাটির উৎপাদিকা শক্তিই কৃষির অধিকাংশ সম্পন্ন করিয়া দেয়, তাহার তুলনায় মনুষ্যের সাহায্য অল্পই আবশ্যক হয়।

যেমন এক জন শিল্পকর কোন বন্যবৃক্ষ হইতে এক দিনে একটী সুন্দর বাক্স তৈয়ার করিতে পারে, কিম্বা অপরিষ্কৃত লৌহ হইতে সুপরিস্কৃত ও সুশাণিত ছুরিকা নির্ম্মাণ করিতে পারে; অথবা এক জন বণিক আপন ব্যবসায় কার্য্যে এক দিনে পাঁচ টাকা লাভ করিতে পারে; তেমনি এই সকল

কার্য্যের মধ্যে বিরাম আছে। কারণ মানুষের শরীর প্রতি দিন সমান বহে না এবং উহার অন্তবিধ ব্যাঘাত সকলও নিয়তই উপস্থিত হইয়া থাকে। কিন্তু মৃত্তিকার উৎপাদিকা শক্তির বিরাম নাই। ঐ মহাশক্তি মানবকুলের হিতৈষিণী দেবতার ন্যায় বিঘ্নকে পায় ঠেলিয়া অবিশ্রান্ত তাহাদের ইষ্ট সাধন করিয়া থাকেন। আমরা যখন শ্রান্তি দূর করিবার জন্য নিদ্রায় অভিভূত হইয়া থাকি, জল, ঝড়, রৌদ্রাদির ভয়ে গৃহমধ্যে লুকাইয়া থাকি, কিম্বা পীড়িত হইয়া অকর্ম্মণ্য ভাবে শয্যায় পড়িয়া থাকি, ঐ শক্তি তখনও কোন বীজকে অঙ্কুরিত করিতেছেন, কচি পাতাটীকে পাকাইতেছেন, মুকুলটীকে ফুটাইয়া ফুলে সুগন্ধ,—ফলে অমৃতস্বাদ বিতরণ করিতেছেন।

ফলতঃ উৎপাদিকা শক্তিই জল, বায়ু, আলোক ও তাপ এই গুলিকে সহযোগী করিয়া কৃষিকার্য্য সম্পন্ন করিয়া থাকে। ঐ গুলির উপযুক্ত রূপ যোগাযোগ হইতেছে কি না, আমাদিগকে কেবল তাহাই দেখিতে হয়। যিনি উত্তম রূপে উহা দেখিতে পারেন, তিনিই উত্তম কৃষক।

তোমার বন্ধুর হাতে একখানি উত্তম ছুবি দেখিয়া তোমার তাহা পাইতে ইচ্ছা হইল, তুমি তৎক্ষণাৎ বাজার হইতে ঠিক্ সেই রূপ একখানি ক্রয় করিয়া আনিলে। কিন্তু তোমার বন্ধুর বাগানের উত্তম উত্তম ফল ফুলের গাছের ন্যায় গাছগুলি, এক দিনে তৈয়ার করিতে পারিবে না। বৃক্ষাদি তৈয়ার করিতে বালক কালে মানুষের প্রবৃত্তি থাকে না বটে, কিন্তু তজ্জন্য পরে অনুতাপ হয়। অতএব অন্যান্য শিক্ষার ন্যায় বালক কাল হইতেই বৃক্ষাদি প্রস্তুত করিতে শিক্ষা করা উচিত। কেবল

শিক্ষা নয়, শিক্ষার সঙ্গে সঙ্গে পরীক্ষাও আরম্ভ করিতে হইবে। বালকগণ যদি দশ বার বৎসর বয়স হইতে কৃষিকার্য্যে,—বিশেষতঃ উদ্যান কার্য্যে মনোযোগ করে, তাহা হইলে বড়ই সুখের বিষয় হয়। তাহারা সংসারে প্রবিষ্ট হইয়াই সাংসারিক অন্যান্য সুখের সঙ্গে হস্তার্জ্জিত বৃক্ষের ফলভোগের অপূর্ব্ব সুখও ভোগ করিতে পারে।

---

# দ্বিতীয় পাঠ।

মনুষ্যের প্রথমাবস্থায় বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষি সহজ,
সুবিধাজনক ও এক মাত্র অবলম্বন।

মনুষ্যেরা জীবিকার্জ্জন ও সুখ সচ্ছন্দতা লাভের জন্য যে সকল কার্য্য করেন, তৎসমুদয় তিন শ্রেণীতে বিভক্ত হয়। প্রথম পাশুপাল্য, দ্বিতীয় কৃষি, তৃতীয় বাণিজ্য। শিল্প, কৃষিও বাণিজ্যেরই অন্তর্গত। চাকরি, ভিক্ষাদি উপায়গুলি অপ্রধান এবং অধিকাংশ উপায় কৃষি বাণিজ্যেরই আনুষঙ্গিক। আদিমাবস্থায় মনুষ্যেরা যখন নগ্নভাবে তরু-কোটরে কিম্বা গিরি-গহ্বরে বাস করিতেন, তখন বন্য ফল মূল, মৃগয়ালব্ধ মাংস এবং নদী কিম্বা ঝরণার জলে তাঁহাদের জীবিকা নির্ব্বাহ হইত। তাঁহাদিগকে প্রতিদিন নূতন পশু সন্ধান এবং তাহা বধ করিয়া তাহার মাংস সংগ্রহ করিতে হইত। কোন দিন মাংসাদির সমাবেশ না হওয়ায় হয়ত উপবাস করিতেও হইত। এমন অবস্থায় দুই চারিটী জীবিত পশু ধরিয়া রাখা কিয়ৎ পরিমাণে

সুবিধাজনক, ইহা অবশ্যই আদিম মানবগণের মনে উপস্থিত হইয়াছিল। এই রূপেই পশুপালন ব্যবসায়ের উৎপত্তি হয়।

স্বভাবজাত বৃক্ষাদি হইতে সর্ব্বদা মনের মত ফল মূল প্রাপ্ত না হওয়ায়, ঐরূপে কৃষিরও উৎপত্তি হইয়াছে। শ্রীমদ্ভাগবতে কথিত আছে, পৃথুরাজ কর্ত্তৃক কৃষি-প্রণালীর উৎপত্তি হয় এবং তজ্জন্য তাঁহার নামানুসারে "পৃথিবী" নামের সৃষ্টি হইয়াছে। কৃষি প্রণালীর উৎপত্তি স্বাভাবিক, ব্যক্তিবিশেষকে উহার উৎপাদক বলিয়া বোধ হয় না। তবে পৃথুরাজের দ্বারা উহার উন্নতি হইয়াছিল, ইহা সহজেই স্বীকার করা যায়। যাহা হউক, আদিমাবস্থায় কৃষি দ্বারা যে সকল ফল, মূল, শস্যাদি উৎপন্ন হইতে লাগিল, তাহা হইতে আপন আপন প্রয়োজনমত সামগ্রী রাখিয়া তাহারা অবশিষ্ট অপরকে দিতে লাগিল। অপরে আবার তাহার পরিবর্ত্তে আপন কৃষির উৎপন্ন অন্যবিধ সামগ্রী নিজের প্রয়োজনমত রাখিয়া অবশিষ্ট তাহাকে দিতে লাগিল। এই রূপেই বাণিজ্যের উৎপত্তি হইয়াছে। বাণিজ্যের এই প্রণালীকে বিনিময়-প্রথা কহে। ঐ প্রণালীর বাণিজ্য কার্য্যে বিলক্ষণ অসুবিধা ছিল। কিন্তু এক্ষণে বিবিধ মুদ্রা প্রচলিত হওয়ায়, ঐ অসুবিধার সম্যক্ নিরাকরণ হইয়াছে।

যাহা হউক, উক্ত বিবরণ দ্বারা প্রতীত হয় যে, কৃষি কার্য্য মনুষ্যের প্রথম অবস্থারই অবলম্বনীয়। বর্ত্তমান সমাজে যাঁহারা অশিক্ষিত বা অর্দ্ধশিক্ষিত এবং অর্থহীন, তাঁহারা ব্রাহ্মণ, কায়স্থ, বৈদ্য, সদ্গোপ, গোয়ালা, মুসলমান যে জাতিই কেন হউন না, এ গ্রন্থে তাঁহাদিগকে প্রথমাবস্থার লোক বলা যাইবে। এক জন সুস্থ, সবল ও পূর্ণবয়স্ক লোকের যদি কিছুমাত্র সংস্থান না

থাকে, সে কোদাল, দা, খন্তা প্রভৃতি যৎসামান্য দুই তিন খানি অস্ত্র লইয়া কৃষিকার্য্যে প্রবৃত্ত হইতে পারে। এক জন মানুষে স্বহস্তে চারি পাঁচ বিঘা ভূমির আবাদ করিতে পারে। ঐ পরিমিত ভূমিতে ন্যূন সংখ্যায় ষোল শত লোকের খাদ্য উৎপন্ন হইতে পারে। তাহা হইতে আপনার সংবৎসরের খাদ্য রাখিয়াও কিছু থাকিয়া যায়। উহা দ্বারা সে পূর্ব্ব বৎসরের ঋণ শোধ কিম্বা লাঙ্গল গোরু করিবার জন্য উহা সঞ্চয় করিতে পারে। যুক্তিতে যেরূপ দেখা যাইতেছে, দৈব ঘটনায়, কার্য্যে বাস্তবিক সেরূপ না ঘটিতেও পারে। সেরূপ না ঘটিলেও কৃষি যে বাণিজ্যাপেক্ষা প্রথমাবস্থার লোকের পক্ষে সহজ ও সুবিধাজনক, উহা দ্বারা সেটি প্রতিপন্ন হইতেছে। কারণ ইহাতে বেশি মূলধনের প্রয়োজন রাখে না। বিশেষতঃ যাহারা স্বহস্তে কার্য্য করিতে সমর্থ, তাহাদের আরও অল্পতর মূলধনে চলিতে পারে। গোরু ও বীজের মূল্য এবং ভূমির খাজনা ইহার জন্যই কিছু টাকার প্রয়োজন হয়। তাহার মধ্যে আবার গোরু ও বীজের মূল্য প্রতি বৎসর লাগে না। যে শস্য বপন করা যায়, অবাধে ন্যূন পরিমাণে তাহার ত্রিশ চল্লিশ গুণ উৎপন্ন হয়। এই উৎপন্ন শস্য হইতে সংসারের ও আবাদের খরচ রাখিয়া প্রায়ই কিছু থাকা সম্ভব। চেষ্টা করিলে বোধ হয়, সকলেই কিছু কিছু রাখিতে পারেন। এই অতিরিক্ত অংশ হইতে ক্রমশঃ ঘর দ্বারের উৎকর্ষ সাধন, পরিবারের মধ্যে লেখা পড়ার চর্চ্চা, এবং বাণিজ্যার্থ মূলধনের সংস্থান হইতে পারে। বিদ্যা ও অর্থের মিলনই সাংসারিক প্রধান উন্নতি। অতএব যাঁহাদের উপার্জ্জনের কোন উপায় নাই এবং উদরান্নেরও

সংস্থান নাই, তাঁহাদের সাবধানে কৃষি কার্য্য করাই বিধেয়।

বঙ্গদেশীয় ব্রাহ্মণ, কায়স্থ ও বৈদ্যাদি উৎকৃষ্ট বর্ণের অবস্থা নিতান্ত হীন হইলেও, তাঁহাদের মধ্যে স্বহস্তে হল-চালনার প্রথা নাই। স্বহস্তে হল চালনা করিতে না হইলেই ভাল; কিন্তু উদরান্নের জন্য ভিক্ষু হওয়া কিম্বা অন্যবিধ অসৎকার্য্য করা অপেক্ষা লাঙ্গল চসা ভাল।

---

# তৃতীয় পাঠ।

## কৃষির ভাল মন্দ।

প্রাচীন শাস্ত্রকারেরা কৃষি কার্য্যের ছয় প্রকার বিঘ্ন নির্দ্দেশ করিয়াছেন। ঐ সকল বিঘ্নের নাম ঈতি। যথা— অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি, মূষিক, পঙ্গপাল, ধান্যভুক্পক্ষী, বিদেশীয় আক্রমণকারী রাজগণ। এই সকল উৎপাত কৃষির এবং তদুৎপন্ন শস্যাদির বিশেষ অনিষ্টকর। এক সময়ে অতি-বৃষ্টি দ্বারা কৃষির যেমন হানি হয়, সময়ান্তরে এক কালে বৃষ্টি না হইয়াও তদধিক ক্ষতি করে। মূষিকাদি যে কৃষির অনিষ্টকর ইহা সকলেই অবগত আছেন; কিন্তু ইহা সামান্য অনিষ্ট, ইহা দ্বারা কৃষির বিশেষ হানি হয় না। বিদেশীয় কোন রাজা দেশ আক্রমণ করিলে, অর্থাৎ দেশের মধ্যে যুদ্ধ উপস্থিত হইলে প্রজারা স্ব স্ব ধন প্রাণ লইয়াই শশব্যস্ত হয়; সুতরাং কৃষি কার্য্যে কিছুমাত্র মনোযোগ করিতে পারে না। ১৮৭০ খৃঃ অব্দে ফরাসি ও প্রুসিও সাম্রাজ্যের মধ্যে যে ভয়ঙ্কর যুদ্ধ ঘটনা হইয়া-

ছিল, তাহাতে প্রুসিওগণ জয়ী হইয়া কৃষির ক্ষতিপূরণ স্বরূপ ফরাসিদিগের নিকট হইতে বহুলক্ষ অর্থ লয়, ইহা অনেকেরই বিদিত থাকিতে পারে। ১৮৭৭ খৃঃ অব্দে রুসিয়া ও তুরস্কের মধ্যে যে যুদ্ধ উপস্থিত হয়, তাহাতে কৃষির সমতা রক্ষার্থ রুসিও-গণ অগ্রেই স্বদেশ মধ্যে দশ হাজার লাঙ্গল বৃদ্ধি করেন।

কৃষিকার্য্যের এই সকল পুরাতন ব্যাঘাত ভিন্ন অধুনা এক নূতন ব্যাঘাত উপস্থিত হইয়াছে। দেশের দেবমাতৃকতা এবং ভূমির অনুর্ব্বরতাই সেই ব্যাঘাত। যে দেশের আবাদ কেবল বৃষ্টি-বারির উপর নির্ভর করে, সেই দেশকে দেবমাতৃক কহে। ভারতবর্ষ এইরূপ দেশ। কিন্তু পূর্ব্বতন হিন্দু রাজগণ ঐ দৈব ব্যাঘাত দূর করিবার চেষ্টা করিতেন। ভারবি-প্রণীত কিরাতা-র্জ্জুনীয় গ্রন্থ পাঠে জানা যায়, রাজা দুর্য্যোধন অনেক দেবমাতৃক দেশকে কূপ, সরিৎ, পুষ্করিণী খনন দ্বারা নদীমাতৃক করিয়া-ছিলেন। এক্ষণে ইংরাজ রাজপুরুষগণও ভারতের নানা স্থানে খাল ও কূপ খনন, বাঁধ বাঁধা, নদীর প্লাবন হইতে পার্শ্ববর্ত্তী কৃষি ক্ষেত্র রক্ষা করা প্রভৃতি নানাবিধ কার্য্য করিতেছেন। তবে রাজার স্বদেশীয় রাজ্যের জন্য যেমন যত্ন হয়, বিদেশীয় রাজ্যের জন্যও তখন তেমন সারবতী চেষ্টা হইবে, তখন ইংলণ্ড, জর্ম্মনি, ইউনাইটেড্ ষ্টেটের ন্যায় ভারতীয় কৃষিরও উন্নতি হইবে।

এদেশীয় কৃষির পক্ষে পূর্ব্বে দেবমাতৃকতা অনুকূল উপায় ছিল। কারণ পূর্ব্বে যথাকালে সুবৃষ্টি প্রায়ই হইত; বৃষ্টির অভাবে শস্যহানি হইত না। বিশেষ, পূর্ব্বে এখনকার মত এদেশীয় শস্য বিদেশে রপ্তানি হইত না এবং লোকসংখ্যাও

এখনকার মত অধিক ছিল না। অধিকন্তু ভূমিও বিলক্ষণ উর্ব্বরা ছিল। সুতরাং তখন এক বৎসরে যে শস্য জন্মিত, তদ্দ্বারা দুই তিন বৎসর চলিয়া যাইতে পারিত; এক বৎসর বৃষ্টির অভাব বা অতিশয্যে কৃষির ব্যাঘাত হইলে দেশের বিশেষ হানি হইত না। এখন পূর্ব্বের তুলনায় সকলই বিপরীত। সুতরাং এ বৎসর কোন গতিকে কৃষির একটু মাত্র ব্যাঘাত হইলে, আর বৎসর নিশ্চয়ই দুর্ভিক্ষ হইবে এবং শত সহস্র মহাপ্রাণীর বিনাশ হইবে। এই রূপেই বিগত দশ বার বৎসরের মধ্যে বাঙ্গালা, বিহার, উড়িষ্যা, মান্দ্রাজ ও বোম্বের মধ্যে কয়েকটা ভয়ঙ্কর দুর্ভিক্ষ হইয়া গিয়াছে এবং মান্দ্রাজে এ বর্ষেও দুর্ভিক্ষ হইয়াছে।

যে ভূমি উপযুক্ত রূপ শস্য প্রসব করে না, তাহাকে উর্ব্বরা বলা যায় না। আমাদের দেশ স্বভাবতঃ অনুর্ব্বর নহে। কোন কারণ বশতঃ এখন সম্পূর্ণ শস্য প্রসব করে না। কি কারণে ভূমি অনুর্ব্বরা হইয়া যাইতেছে? এ প্রশ্ন সহজেই উপস্থিত হইতে পারে। এক ভূমিতে পুনঃ পুনঃ একবিধ শস্যের চাষ করিলে ঐ জমির তেজ কমিয়া যায়। এই জন্য এদেশের কৃষকগণ দুই তিন বৎসর অন্তর দুই তিন বৎসর জমি ফেলিয়া রাখেন, কিম্বা তাহাতে অন্য প্রকার শস্যের আবাদ করেন। কোন্ শস্যের পর কোন্ শস্যের আবাদ করিলে ভূমি ও শস্য কাহারই হানি হয় না, তাহা জানা বিশেষ আবশ্যক। কারণ ক্রমশঃ লোকসংখ্যার আধিক্য এবং রপ্তানি হেতু শস্যের মূল্য বৃদ্ধি হওয়ায় এখন আর জমি ফেলিয়া রাখিবার উপায় নাই। এক জমিতে ভিন্ন ভিন্ন দ্রব্যের আবাদ করিলে ভূমি সহসা অনুর্ব্বরা হইতে পারে না। কিন্তু এদেশে ধানের চাসই প্রায় সর্ব্বত্র; যেহেতু ধানই এ

দেশের প্রধান শস্য। কাজেই ভূমি ক্রমশঃ অনুর্ব্বরা হইয়া আসিতেছে।

অতএব দেখা যাইতেছে, দেশের দেবমাতৃকতার প্রতিকূলতা এবং ভূমির অনুর্ব্বরতা এখন কৃষির বিলক্ষণ ব্যাঘাত হইয়া দাঁড়াইয়াছে। ইহার প্রতিকার আবশ্যক। এ বিষয়ে দেশের রাজা ও জমিদারগণ মনোযোগী না হইলে কেবলমাত্র প্রজাগণের যত্নে কিছুই হইতে পারে না। দেশের সর্ব্বত্র খাল কাটাইয়া এবং বাঁধ বাঁধাইয়া এরূপ বন্দোবস্ত করা উচিত যে, চাসারা আবাদি জমিতে আবশ্যক মত জল পাইতে পারে এবং অতি বৃষ্টির অতিরিক্ত জল সহজেই ভূমি হইতে বাহির করিয়া দিতে পারে। মেদিনীপুর জিলার কোন কোন নদীতে ঐ রূপ বন্দোবস্ত আছে, বোধ হয়, তাহা অনেকেই দেখিয়া থাকিবেন। এদেশের সর্ব্বত্র ঐ রূপ ব্যবস্থা হওয়া আবশ্যক। যেখানে ঐ প্রণালী ব্যবস্থাপনের নিতান্ত ব্যাঘাত আছে, সেখানে কাজেই হইবে না।" শস্যক্ষেত্রে জলসিঞ্চন-প্রথা, উত্তর-পশ্চিমাঞ্চলে অনেক দিন হইতে প্রচলিত হইয়াছে। বিহারেও ১৮৭৪। ৭৫ সালের দুর্ভিক্ষের সময় হইতে খাল কাটান হইয়াছে। বঙ্গদেশেও খাল খননের কিছু কিছু আয়োজন দেখা যাইতেছে। বোধ হয়; আর দশ বার বৎসরের মধ্যে, জলের অভাবে বা অতিরিক্ত সদ্ভাবে এদেশীয় কৃষি কার্য্যের অনিষ্ট, এক কালে নিবারিত হইবে। বিলাতীয় গবর্ণমেণ্টের জয় হউক, যেহেতু তাঁহারা প্রাচীন ভারতকে বর্ত্তমান জন-সমাজের অনুরূপ করিবার মনস্থ করিয়াছেন। যদি লর্ড বেণ্টিক্ বাহাদুর দীর্ঘ কাল এদেশ শাসন করিতেন, তাহা হইলে আমরা গবর্ণমেণ্টের নিকট

হইতে কৃষি বিষয়ে যে সকল হিতানুষ্ঠান এখন প্রত্যাশা করি-তেছি, তাহা কোন কালে সম্পন্ন হইয়া যাইত। উক্ত লর্ড বাহাদুর ১৮৩৫ সালের ৮ই এপ্রেল তারিখে ভারতবর্ষীয় এগ্রি-কালচার সোসাইটীর মেম্বরদিগকে যে পত্র লিখিয়াছিলেন, এদেশীয় কৃষির উন্নতিকল্পে তাঁহার কিরূপ সদভিপ্রায় ছিল, তৎপাঠে তাহা উত্তমরূপে জানা যায়। তিনি সেই পত্রে লিখিয়াছিলেন—"যদি ভারতবর্ষে আমার আর কিছু কাল থাকা হইত, তবে মানস ছিল, পশ্চিম, মধ্য ও বঙ্গদেশে কৃষিশিক্ষার্থ ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র উদ্যান সকল প্রস্তুত করাইয়া তাহাতে কৃষি ও নানা-বিধ শস্যোৎপাদনের সদুপায় শিক্ষা দেওয়ার ব্যবস্থা করিতাম। ঐ সকল উদ্যান এক একটী পাঠশালার কার্য্য করিত এবং তথা হইতে উত্তম উত্তম বৃক্ষাদির কলম ও বীজ সর্ব্বত্র বিতরণ করিয়া দেশমধ্যে কৃষির প্রচার করিতাম।—ইত্যাদি।" যাহা হউক, সম্প্রতি রাসায়নিক পণ্ডিতগণ বলিতেছেন যে, নিয়ত খালের জল সিঞ্চনে কৃষি-ক্ষেত্র অনুর্ব্বর হইয়া যায়; কূপ বা পুষ্করিণীর জলে ক্ষেত্রের তাদৃশ অনিষ্ট হয় না। অতএব কৃষিক্ষেত্রের নিকটে কূপ ও পুষ্করিণী খননের ব্যবস্থা করাও বিধেয়।

লাবণিক পদার্থ এবং যবক্ষারজান, উদ্ভিদের বিশেষ উপ-কারী। খালের জলে ঐ দুই পদার্থ অল্প, কিন্তু বৃষ্টির জলে উহা অধিক পরিমাণে দৃষ্ট হয়। পুষ্করিণীর জলাপেক্ষা কূপোদকে লাবণিক পদার্থ অধিক পরিমাণে আছে।

ভূমির উর্ব্বরতা বৃদ্ধির যে যে উপায় আছে, তন্মধ্যে ভূমি সময়ে সময়ে জলপ্লাবিত হওয়াই সর্ব্বপ্রধান। ১২৯২ সালের মহাবন্যায় সকলেই তাহার বিশেষ প্রমাণ পাইয়াছেন। এই

বৎসরের ন্যায় হরিৎ খন্দ আর কখন হইয়াছিল কিনা, তাহা কাহার স্মরণ হয় না। নদীতীরবর্ত্তী স্থান সকলের মধ্যে স্বভাবতই এরূপ ঘটনা ঘটিয়া থাকে। এদেশে বিশেষতঃ বাখরগঞ্জ, ফরিদপুর, ঢাকা, শ্রীহট্ট, ২৪ পরগণা, যশোহর প্রভৃতি জিলায় অনেক বিল ও ঝিল আছে। তাহাতে বর্ষাকালে প্রচুর পরিমাণে জল থাকায় তাহার সমস্তাংশে কোন ক্রমেই আবাদ হইতে পারে না। যদি সেই জল, আবশ্যক মতে কিয়ৎ পরিমাণে বাহির করিয়া দেওয়া যায়, তবে ঐ সকল জলাভূমিতে উত্তমরূপে আমন ধানের চাস হইতে পারে। ঐ সকল স্থানকে আবাদের উপযুক্ত করিতে বড় অধিক ব্যয় হয় না। জমিদারেরা একটু মনোযোগ করিলেই উহা হইতে পারে। জমিদার ঘর হইতে টাকা দিলে কোন ক্রমেই ঐ টাকার লোকসান হয় না। ঐ সকল স্থান আবাদের যোগ্য হইলে উচ্চ হারে বিলি হইতে পারে। যদি জমিদার নিজকোষ হইতে উক্ত কার্য্যে অর্থ ব্যয় করিতে অসম্মত হন, তবে অন্ততঃ প্রজাদিগকে উহার উপযোগিতা বুঝাইয়া দিতে পারিলেও তাহাদিগের নিকট হইতে চাঁদা দ্বারা ঐ অর্থ সংগৃহীত হইতে পারে। কৃষিকার্য্যে উদ্যমশীলতা জমিদারের পক্ষে;—বিশেষতঃ বর্ত্তমানকালে অতি প্রশংসার বিষয়।

# চতুর্থ পাঠ।

## বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষির লাভ অল্প কেন ?

প্রাচীন নীতিবিদ্ পণ্ডিতেরা নির্দ্দেশ করিয়াছেন, বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষির লাভ অল্প। ইহার কারণ কি বুঝিবার চেষ্টা করা উচিত। পূর্ব্বেই উল্লেখ করা হইয়াছে, যাহাদের মূলধন অধিক থাকে না, তাহারাই প্রায় কৃষিকার্য্য করিয়া থাকে। কারণ মূলধনের অল্পতা বা এক কালে অভাব হইলেও কোন রূপে কৃষিকার্য্য চালাইতে পারা যায়। যাহারা এরূপ যৎসামান্য ভাবে কৃষি আরম্ভ করে, তাহাদের নগদ অর্থলাভ প্রায়ই ঘটে না; কোন রূপে মাত্র জীবিকা নির্ব্বাহ হয়। কিন্তু ঐ সকল লোক সহিষ্ণুতা সহকারে দীর্ঘ কাল কৃষিকার্য্য চালাইতে পারিলে তদ্দ্বারা ক্রমশঃ অর্থলাভ করিতে পারে। উহা বাণিজ্য-লব্ধ অর্থের ন্যায় প্রচুর না হইলেও উহাদ্বারা সাংসারিক সুখসচ্ছন্দতা লাভের কোন ব্যাঘাত হয় না; বরং অনেক চাকুরে অপেক্ষা তাহাদের অবস্থা ভাল হয়। ক্ষেত্রজাত বিবিধ শস্য ও বিবিধ বস্তু সর্ব্বদা সংগ্রহ থাকে; কোন বিষয়ে কোন অভাব থাকে না। "চাসী বাসী" গৃহস্থের সুখ দেখিলে বোধ হয়, তাহার ঘরে বাহিরে লক্ষ্মী বিরাজ করিতেছেন!

একজন কৃষিজীবি গৃহস্থ শস্যাকারে বার্ষিক যত লাভ পান, একজন চাকুরে নগদ অর্থে তদপেক্ষা অধিক লাভ পাইলেও তাঁহার সাংসারিক শৃঙ্খলা, প্রথমোক্ত ব্যক্তির ন্যায় হয় না।

ভূমির খাজনা, মহাজনের সুদ, অজন্মা কিম্বা অতিশয়

স্বল্পন্যাদি কারণে কৃষির লাভসমষ্টি অল্প হইয়া পড়ে। কারণ এ বৎসর উত্তমরূপে শস্যাদি হইল, পর বৎসর কিছুই হইল না, কিন্তু খাজনা, মাহাজনের সুদ, আবাদখরচ সকলই সম পরিমাণে লাগিল। তবে যদি, অধিক মূলধন খাটাইয়া কৃষির সহিত শিল্পের যোগ করা যায়, অর্থাৎ নীল, রেশম, তুত, চা, গুড় ইত্যাদির কুঠি কারখানা করিতে পারা যায়, তাহা হইলে বাণিজ্যের তুল্য, কিম্বা স্থলবিশেষে তদপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে। অধিক পরিমাণে ধান্য উৎপন্ন করিতে পারিলেও অধিক লাভ হইতে পারে, কিন্তু তাহাতেও অধিক মূলধনের প্রয়োজন। ইয়ুরোপীয় অনেক সাহেব এবং এদেশীয় অনেক জমিদার নীল, তুত, খর্জ্জুর, ইক্ষু প্রভৃতির চাস করিয়া পরে উপরি উক্ত সামগ্রী সকল প্রস্তুত করিয়া থাকেন। নীলের গাছ জলে পচাইয়া নীল তৈয়ার করা, পলুপোকাকে তুত পাতা খাওয়াইয়া রেশম প্রস্তুত করা এবং খর্জ্জুর ও ইক্ষুর রস বাহির করিয়া তাহা হইতে গুড় প্রস্তুত করা ইত্যাদি কার্য্য সকল শিল্পের মধ্যে গণ্য। সুতরাং এ স্থলে কৃষির সঙ্গে শিল্পের যোগ হইয়াছে বলিতে হইবে। এই সকল কার্য্যে অনেক অর্থের প্রয়োজন। তত অধিক অর্থ ব্যয় করিতে, এদেশের অধিক লোকেই অপারক। সুতরাং কৃষিকার্য্য দ্বারা অধিক অর্থ লাভ করা, এদেশের অধিকাংশ লোকের পক্ষে দুর্ঘট। বোধ হয়, এই জন্যই এদেশে বাণিজ্য অপেক্ষা কৃষির অল্প লাভ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইয়ুরোপীয় অনেক অর্থবান্ সাহেব ভারতবর্ষের নানা স্থানে কৃষিকার্য্যের উপযুক্ত উৎকৃষ্ট স্থান সকল মনোনীত করিয়া

তাহাতে বহুসংখ্যক কুঠি নির্ম্মাণ করিয়াছেন। ঐ সকল কুঠি দ্বারা প্রথম প্রথম এদেশীয় প্রজাগণের অনেক উপকার হইয়াছিল। তাহারা নীল, তুত ইত্যাদি নিজ আবাদে প্রস্তুত করিয়া ঐ সকল কুঠিতে স্বমূল্যে বিক্রয় করিত এবং অর্থকৃচ্ছ্র উপস্থিত হইলে কুঠি হইতে অল্প সুদে টাকা ধার পাইত। ক্রমে নানা কারণে নীলকার্য্যের প্রণালী পরিবর্ত্তিত হইল এবং প্রজার উপর ভয়ানক অত্যাচার আরম্ভ হইল। ঐ অত্যাচার সহ্য করিতে না পারিয়া অনেক প্রজা নীলকার্য্যে সাহায্য করা রহিত করিল। গবর্ণমেণ্ট অত্যাচারী নীলকরগণের উপর অসন্তোষ প্রকাশ করায় এককালে অনেক কুঠি বন্ধ হইয়া যায়।

এদেশীয় জমিদার ও ধনী লোকেরা বোধ হয়, সাহেবদিগের অনুকরণেই ঐ সকল কার্য্য আরম্ভ করেন। এরূপ অনুকরণ প্রশংসনীয় তাহার সন্দেহ নাই, কিন্তু তাঁহারা সম্যক্ কৃতকার্য্য হইতে পারেন না, ইহাই দুঃখের বিষয় বলিতে হইবে। কার্য্যক্ষমতা ও অধ্যবসায়ের অভাবই, এরূপ অকৃতকার্য্যতার মূল। প্রতি বৎসরেই নীলের হাটে এক আশ্চর্য্য ব্যাপার লক্ষিত হয়। সাহেবের কুঠির যে নীলের মণ দুই শত টাকা দরে বিক্রীত হয়, বাঙ্গালীর কুঠির সেইরূপ নীলের দেড় শত টাকা দর হওয়া ভার হয়! সাহেব বাঙ্গালী বলিয়াই যে, দরের এরূপ তারতম্য হইয়া থাকে তাহা নহে; উভয়ের নীলের মধ্যে বাস্তবিকই তারতম্য থাকে। বাঙ্গালী কুঠিওয়ালার শৈথিল্য, অক্ষমতা ও অনুৎসাহ বশতই সেরূপ ক্ষতিজনক ব্যাপার সংঘটিত হয়। তবে কুঠিয়াল জমিদারগণের এ দোষ ক্রমে সংশোধন হইতেছে।

কৃষিকার্য্যে অধিক মূলধন নিয়োগ করিতে না পারা,

বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষির লাভ অল্প হইবার যেমন একটী কারণ, আমাদের উপযুক্ত রূপ কার্য্যক্ষমতার অভাবও সেইরূপ তাহার অপর একটী কারণ। 'ক্ষেতের কোণ বাণিজ্যের ধন'—এই প্রবাদের তাৎপর্য্য এই যে, বাণিজ্য দ্বারা যে পরিমাণে লাভ হইয়া থাকে, ক্ষেত্রে ষোল আনা ফসল হইলে বাণিজ্যাপেক্ষা অধিক লাভ হইতে পারে। কিন্তু কৃষিকার্য্যে সচরাচর সম্পূর্ণ শস্য পাওয়া যায় না বলিয়াই বাণিজ্যাপেক্ষা কৃষির লাভ অল্প হইয়া দাঁড়ায়। ক্ষেত্রে সম্পূর্ণ শস্য জন্মিবার যে সকল ব্যাঘাত আছে, তাহা দূর করা মানুষের অসাধ্য নহে।

---

# পঞ্চম পাঠ।

## কৃষিই, শিল্প ও বাণিজ্যের মূল।

কৃষি, শিল্প ও বাণিজ্য এই তিনটী পরস্পর নিতান্ত সাহায্য-সাপেক্ষ। ইহাদিগের একটির অভাবে অন্যটী চলিতে পারে না। কিন্তু শিল্প ও বাণিজ্য ভিন্ন কৃষিকার্য্য চলিতে পারা সম্ভব হইলেও, কৃষি ভিন্ন শিল্প ও বাণিজ্য কোন ক্রমেই চলিতে পারে না। মনুষ্য জাতির নিতান্ত আদিমাবস্থায় যখন শিল্প ও বাণিজ্যের কল্পনাও তাঁহাদিগের মনে উদিত হয় নাই, তখনও তাঁহারা কৃষিকার্য্য করিতেন। তখন স্বাভাবিক সূচাগ্র প্রস্তর-খণ্ড কিম্বা ঝটিকাভগ্ন তরুশাখা দ্বারা ভূমি কর্ষণ পূর্ব্বক কৃষি-কার্য্য নির্ব্বাহ হইত। কিন্তু যদি এরূপ প্রমাণ পাওয়া যায়, তাঁহারা সতুষ ধান্য চর্ব্বণ না করিয়া ধান্য হইতে চাউল, চাউল হইতে অন্ন প্রস্তুত করিয়া আহার করিতেন, তাহা হইলে বলিতে

হইবে যে, কৃষিকার্য্যে না হউক, জীবিকা নির্ব্বাহ বিষয়ে সেই বনবাসী আদিম মানবগণকেও কিয়ৎ পরিমাণে শিল্পের সাহায্য গ্রহণ করিতে হইয়াছিল। ইহা অতি পূর্ব্ব কালের কথা। বর্ত্তমান কালে ঐ তিনের মধ্যে কিরূপ সম্বন্ধ দাঁড়াইয়াছে, এ প্রস্তাবে তাহারই আলোচনা করিতে হইবে।

খনি খনন, তাহা হইতে ধাতু উত্তোলন, এবং সেই ধাতু দ্বারা কৃষিকার্য্যোপযোগী বিবিধ অস্ত্র ও যন্ত্রনির্ম্মাণ—এ সকলই শিল্পের অন্তর্গত। কোদাল, খন্তা, কাস্তে, লাঙ্গল, বিদা, মই ইত্যাদি ভিন্ন সুচারুরূপে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহিত হইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যে, কৃষিকার্য্যে শিল্প-সাহায্য অপরিহার্য্য।

বাজারে বিক্রয় হয় বলিয়াই লোকে পরিশ্রম পূর্ব্বক ঐ সকল দ্রব্য নির্ম্মাণ এবং এক স্থান হইতে স্থানান্তরে প্রেরণ করে। অতএব বাণিজ্যের সুবিধা না থাকিলে শিল্পের উন্নতি হয় না। আবার গাড়ী, নৌকা, থলে, চালা, কৌটা, বাক্স, দাঁড়ী, বাটখরা ইত্যাদি শিল্পজাত দ্রব্য ভিন্ন বাণিজ্য চলিতে পারে না। যেহেতু শিল্প ও বাণিজ্য পরস্পর সাহায্যসাপেক্ষ। কৃষি ও বাণিজ্যের মধ্যেও এইরূপ সম্বন্ধ। কৃষি দ্বারা খাদ্য ও সুখ সামগ্রী উৎপন্ন না হইলে আদৌ বাণিজ্যের প্রয়োজনই হইত না। আবার বাণিজ্যপ্রথা প্রচলিত না থাকিলে, কৃষকগণ কেবল আপনার প্রয়োজন মত শস্যাদি উৎপন্ন করিয়া ক্ষান্ত থাকিত। তাহা হইলে পৃথিবীর অধিকাংশ লোক অনাহারে মরিয়া যাইত। কিম্বা, সকলকেই উদরান্নের জন্য আপন হাতে লাঙ্গল ধরিতে হইত। তাহা হইলে পৃথিবীর এরূপ উন্নতাবস্থা কখনই হইত

না। কিন্তু বাণিজ্যপ্রথা প্রচলিত থাকায়, কৃষক আপনার প্রয়োজনাপেক্ষা অনেক অধিক শস্যাদি উৎপন্ন করে। কারণ কেবল খাদ্যসামগ্রী হইলেই চলে না কৃষক অন্যান্য গৃহসামগ্রী ক্রয় করিবার জন্য অতিরিক্ত শস্য বিক্রয় দ্বারা অর্থ লাভ করে। কৃষকাদির এইরূপ স্বার্থ সাধন চেষ্টা হইতেই বাণিজ্যের উৎপত্তি হয় এবং সেই বাণিজ্য দ্বারাই অপর সাধারণের অভাব মোচন হয়।

কেহ কেহ এরূপ কহিতে পারেন যে, কৃষির সাহায্য ব্যতিরেকেও শিল্প ও বাণিজ্য চলিতে পারে। যেমন লাপ্‌লণ্ড, গ্রীন্‌লণ্ড, ফিন্‌লণ্ড প্রভৃতি স্থানের লোকেরা কেবল মৎস্য মাংস দ্বারা জীবিকা নির্ব্বাহ করে ও সেই সেই দেশে ঐ দুই দ্রব্যেরই বাণিজ্য হইয়া থাকে। ঐ দেশবাসীরা খনি হইতে ধাতু উত্তোলন করিয়া মৎস্য ও পশু হননোপযোগী অস্ত্র শস্ত্র নির্ম্মাণ করে; পশু, পক্ষী, মৎস্যাদির চর্ম্ম, মাংস, বসাদির দ্বারা বিবিধ প্রয়োজনীয় পদার্থ প্রস্তুত করে, তাহাতে কিছুমাত্র কৃষির সাহায্য আবশ্যক হয় না। এই কথা প্রকৃত হইলেও কৃষির প্রাধান্য অস্বীকার করিবার কারণ নাই। যেহেতু রসায়নবিদ্ পণ্ডিতগণ বলেন, কেবল মৎস্য, মাংস ভক্ষণ করিয়া মনুষ্য দীর্ঘকাল অব্যাহত বা জীবিত থাকিতে পারে না। অতএব তাহাদিগকে কোন না কোনরূপ উদ্ভিদ্ ভক্ষণ করিতে হয়। সুতরাং ঐ সকল দেশও এক কালে কৃষিনিরপেক্ষ বলা যাইতে পারে না। অতএব দেখা যাইতেছে যেরূপ খাদ্য মনুষ্যকে সুস্থ ও দীর্ঘজীবী করে, তাহা কৃষি ভিন্ন জন্মে না। এই জন্যই কৃষিকে শিল্প ও বাণিজ্যের মূল বলা হইয়াছে।

## ষষ্ঠ পাঠ।

### কৃষিকার্য্য কিরূপে করিতে হয়।

এ দেশে কৃষি-বিষয়ক শাস্ত্রের লোপ হইয়াছে। প্রাচীন হিন্দু জাতির কৃষি শাস্ত্রের মধ্যে মহর্ষি পরাশর প্রণীত এক মাত্র "কৃষি-পরাশর" আখ্য কৃষি গ্রন্থের নাম শুনিতে পাওয়া যায়। ঐ গ্রন্থের যে সকল অংশ বর্ত্তমান কৃষি প্রণালীর উপযোগী, আমরা এই গ্রন্থের যথাস্থানে সেই সকল অংশের সার সংগ্রহ ও সমালোচন করিব। ইহা ব্যতীত এ দেশে কতকগুলি কৃষি-বিষয়ক প্রবাদ, বহুকাল হইতে প্রচলিত আছে। সেই সকল প্রবাদও, যথাসাধ্য সংগ্রহ করিবার চেষ্টা করিব। কারণ অনেক প্রবাদ কৃষিকার্য্যের বিলক্ষণ উপযোগী। যে হেতু প্রাচীন কৃষি শাস্ত্রই ঐ সকল প্রবাদের মূল।

ফলে এ দেশীয় কৃষকগণের মধ্যে কৃষি বিজ্ঞানের কিছু মাত্র চর্চ্চা নাই। তাঁহারা পারম্পর্য্য উপদেশ, আপনাদিগের অভি-জ্ঞতা এবং দুই চারিটী প্রবাদ, ইহার সাহায্যেই কৃষি কার্য্য করিয়া থাকেন। বাস্তবিকও কি সংস্কৃত, কি বাঙ্গালা, কোন ভাষাতেই কৃষি বিষয়ক এমন এক খানি পুস্তক নাই, যাহা অব-লম্বন করিয়া যে সে ব্যক্তি কৃষি কার্য্য করিতে পারেন। আবার এ দেশেব কৃষকগণ নিরক্ষর বলিয়া কৃষিশাস্ত্রের তাদৃশ প্রয়ো-জনও ছিল না। সম্প্রাত কৃষিকার্য্যের প্রতি ভদ্র সমাজের একটু দৃষ্টি পতিত হওয়ায় বঙ্গ ভাষায় কৃষি বিষয়ক কয় খানি পুস্তক প্রণীত হইয়াছে; কিন্তু বোধ হয়, তাহার অধিকাংশ, গ্রন্থান্তর কিম্বা কেবল লোকের বাচনিক উপদেশ হইতে

সংগৃহীত। এতাদৃশ পুস্তক পাঠের অভিজ্ঞতায় কৃষি কার্য্য করা যাইতে পারে না। আমি নিজেই উহার সাক্ষ্য দিতে প্রস্তুত হইয়াছি। ঐ সকল গ্রন্থ পাঠ কালে বোধ হয়, যাহা পড়িলাম, তাহা বুঝিলাম; কিন্তু সময় কালে তদনুসারে কার্য্য করিয়া উঠা যায় না। এই জন্য আমি এই গ্রন্থে কৃষি বিষয়ক পরীক্ষাসিদ্ধ নিয়ম ও উপদেশ সকলই অধিক পরিমাণে সংগ্রহ করিয়াছি। বোধ হয়, ইহার অবলম্বনে অনেকে উত্তম রূপে কৃষিকার্য্য নির্ব্বাহ করিতে সমর্থ হইতে পারেন। আমি স্বয়ং যে সকল নিয়মের পরীক্ষা করি নাই, তাহা সত্য কি মিথ্যা, পাঠকগণ পরীক্ষাকালে বুঝিতে পারিবেন। কৃষি বিষয়ক শাস্ত্র, হাজার সম্পূর্ণ হইলেও তাহা পাঠ মাত্র করিয়া নিশ্চিন্ত থাকা উচিত নহে। যাবতীয় শস্যের উৎপত্তি ও হ্রাস স্বচক্ষে প্রত্যক্ষ করা কর্ত্তব্য। যত দিন পঠিত জ্ঞান কার্য্যে পরিণত না করা যায়, তত দিন পাকা কৃষক হওয়া যায় না। কিরূপে কৃষি-পরীক্ষা করিতে হয়, তাহা, কৃষিগেজেটে প্রকাশিত বোম্বাই, ভাদগ্রাম, মান্দ্রাজ, আরাকান, বেহার, কাণপুর লঙ্কা, ব্রিটিস্‌বর্ম্মা প্রভৃতির আদর্শ ক্ষেত্রের বিবরণ পাঠ করিয়া শিক্ষা করা উচিত। সে সকল বিবরণ বহু বিস্তৃত। এ ক্ষুদ্র গ্রন্থে তৎসমুদয় প্রকাশের স্থান হয় না।

এদেশীয় নিম্ন শ্রেণীস্থ লোকদিগকে সামান্য রূপ লেখা পড়া শিখাইবার জন্য বঙ্গ দেশীয় গবর্ণমেণ্ট্‌ বিগত কয়েক বর্ষ হইতে কিছু কিছু যত্ন করিতেছেন। যদি এই সময়ে সরল বঙ্গ ভাষায় কৃষি বিষয়ক দুই এক খানি পুস্তক বাহির হয়, তাহা হইলে এদেশীয় কৃষকগণের বাস্তবিক কিছু উপকার হইতে পারে। আমি

প্রায় তিন বৎসর কাল পরিশ্রম ও পরীক্ষা করিয়া কৃষি বিষয়ক এই প্রবন্ধটী প্রণয়ন করিয়াছি। ইহা দ্বারাও ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হইতে পারে। আমার বিলক্ষণ ভরসা হয় যে, মনোযোগের সহিত এই পুস্তক পঠিত হইলে কৃষিকার্য্যে কিছু না কিছু উপকার, অবশ্যই পাওয়া যাইবে।

কোন সময়ে দেশ-প্রচলিত ভাষায় কৃষিবিষয়ে যতগুলি পুস্তক থাকে, উদ্যোগী কৃষকের তৎসমুদায়ই পাঠ ও তল্লিখিত বিষযেব পরীক্ষা করা উচিত। কৃষি শাস্ত্রের ভ্রম নিবন্ধন অনিষ্ট অধিক কাল স্থায়ী হইতে পারে না। কারণ পরীক্ষা দ্বারাই সে ভ্রমের সংশোধন হইয়া যায়। কোন গ্রন্থের ভ্রমাত্মক নিয়ম যে বার পরীক্ষা করা যায়, সেই বারেই কৃষকের কিছু ক্ষতি হইতে পারে; কিন্তু দ্বিতীয় বারে কোন ভ্রমের সম্ভাবনা থাকে না। পরীক্ষা-ক্ষেত্রস্থ শস্যাদির উৎপত্তি ভাল হউক, কিম্বা মন্দই হউক, শিক্ষা সম্বন্ধে সকলই সমান উপকারী। কারণ শস্যাদির উৎপত্তি কি প্রণালীতে উত্তম রূপে হইতে পারে, ইহা জানা যেমন আবশ্যক, কি প্রণালীতে শস্যাদি উৎকৃষ্ট রূপে হয় না, তাহা জানাও সেইরূপ আবশ্যক। যে গ্রন্থে কৃষি-বিষয়ক উপদেশ সংগৃহীত হয়, মনোযোগী কৃষকের পক্ষে চিরকাল তাহার সাহায্যের প্রযোজন হয় না। ভিন্ন ভিন্ন কৃষি-প্রণালী সকল এক বার আয়ত্ত হইয়া গেলে আর গ্রন্থ পাঠ আবশ্যক হয় না।

হয়ত অনেকের এই রূপ সংস্কার আছে যে, বৎসরের মধ্যে কৃষিকার্য্যে দুই এক বার মনোযোগ করিলেই যথেষ্ট হয়, সর্ব্বদা তাহার ভাবনা ভাবিতে হয় না। কিন্তু এ সংস্কার নিতান্ত

ভ্রমাত্মক। সর্ব্বদা সচিন্ত, সাবধান, অনলস ও উদ্যোগী হইতে না পারিলে কৃষিকার্য্য করা বিড়ম্বনা মাত্র। একটী কোন শিল্প-সামগ্রী নষ্ট হওয়া গেলে তুমি তৎক্ষণাৎ তদ্রূপ আর একটী আনিয়া তাহার ক্ষতিপূরণ করিতে, কিম্বা ক্ষতি জন্য যে দুঃখ হইয়াছিল তাহা নিবারণ করিতে পার। কিন্তু শস্য-ক্ষেত্র ও বাগানের ক্ষতি হইলে সহসা তাহার পূরণ হইবার উপায় নাই। অতএব পাকা পাঁচোর, চিতে, কচা, সিজ, কাঁটা প্রভৃতির বেড়া, মাটীর পাট, কঞ্চির ঘেরা ইত্যাদি দ্বারা ফল ফুলের চারা ও শস্যক্ষেত্র উত্তমরূপে রক্ষা করিবে। যদি বাগানে পাঁচীর কি পাটের সংযোগ করিতে না পার, তাহা হইলে অধিকতর মনোযোগের সহিত প্রতি দিন তত্ত্বাবধান দ্বারা চারাদি রক্ষা করিবে, নতুবা দুইচারি বৎসরের যত্ন ও পরিশ্রম এক মুহূর্ত্তে বিফল হইয়া যাইতে পারে।

যে স্থলে চতুঃপার্শ্ববর্ত্তী কৃষক-সাধারণের শিক্ষার জন্য উৎকৃষ্ট প্রণালী অনুসারে বিবিধ শস্যের আবাদ হইয়া থাকে, তাহাকে আদর্শ ক্ষেত্র কহে। বিলাতে ঐ রূপ অনেক আদর্শ ক্ষেত্র আছে। তাহাতে তত্রত্য কৃষকগণের কৃষি শিক্ষার বিলক্ষণ সুবিধা হয়। এ দেশে ঐ রূপ আদর্শ ক্ষেত্র পূর্ব্বে ছিল না; এক্ষণে নানা স্থানে অনেকগুলি আদর্শ ক্ষেত্র প্রতিষ্ঠিত হইয়াছে এবং তাহাতে অনেক প্রকার আবাদের পরীক্ষা হইতেছে, পূর্ব্বে তাহার উল্লেখ করা হইয়াছে। কিন্তু তাহার সংখ্যা যথেষ্ট নহে। ফলে স্বদেশের মঙ্গল করিবার জন্য যাঁহাদের প্রকৃত ইচ্ছা আছে, তাঁহাদের ঐ বিষয়ে মনোযোগী হওয়া উচিত। বর্দ্ধমান রাজ, ডুমরাওনরাজ, মান্দ্রাজবাসী কৃষ্ণস্বামী মুদালিয়ার এই

তিন মহাত্মা আপাততঃ দেশীয় কৃষির উন্নতি জন্য মনোযোগ করিয়াছেন। প্রথম দুই ব্যক্তি গবর্ণমেন্ট নিয়োজিত তত্ত্বাবধায়কের সাহায্যে আপন আপন রাজ্যে এক একটী আদর্শ ক্ষেত্র খুলিয়াছেন। তৃতীয় ব্যক্তির অনেকগুলি আবাদের যোত আছে। তিনি আপন আবাদে কৃষকগণের উপকার জন্য বিবিধ শস্য ও কৃষি যন্ত্রের পরীক্ষা করিতেছেন। তিনি এক প্রকার নূতন লাঙ্গল নির্ম্মাণ করিয়াছেন; তাহা দ্বারা পুরাতন লাঙ্গল অপেক্ষা অল্প ব্যয়ে ও অল্প সময়ে অধিক কাজ হইতেছে। শত শত গ্রন্থ পাঠ করিয়া কৃষি কার্য্যে যাদৃশ উপকার পাওয়া না যায়, এইরূপ একটী আদর্শ ক্ষেত্রের কার্য্য দর্শন করিলে সেইরূপ উপকার পাওয়া যাইতে পারে। যত দিন এদেশের প্রত্যেক প্রধান স্থানে আদর্শ ক্ষেত্রের সৃষ্টি না হয়, তত দিন মাঠে মাঠে কৃষকের সঙ্গে সঙ্গে কিয়ৎকাল ভ্রমণ করিয়া নূতন কৃষককে কার্য্য শিক্ষা করা উচিত। ইহাতেও কিয়ৎপরিমাণে উপকার পাওয়া যাইতে পারে। দেশীয় জমীদারগণ মনে করিলে প্রত্যেক কৃষি প্রধান স্থানে ঐরূপ আদর্শ ক্ষেত্রের সৃষ্টি করিতে পারেন।

যথাকালে কৃষি বিষয়ক কর্ত্তব্য সাধনের জন্য কৃষককে সর্ব্বদা সতর্কতার সহিত প্রস্তুত থাকিতে হয়। কারণ কৃষির অনেক কার্য্য বাহ্য প্রকৃতির অবস্থার উপর নির্ভর করে। ঐ অবস্থার সুযোগ পরিত্যাগ করিলে কৃষককে বিলক্ষণ অসুবিধা ভোগ করিতে ও ক্ষতিগ্রস্ত হইতে হয়। মনে কর, কুজ্ঝটিকার দিন তামাকের পাটী বা ছালা বাঁধা আবশ্যক। কারণ কুজ্ঝটিকাকালীন আর্দ্র বাতাসে তামাক অতিশয় কোমল হয়, তদবস্থায়

বাঁধিলে তামাক ভাঙ্গিয়া ও ঝরিয়া নষ্ট হয় না। আলস্য প্রযুক্ত একটী কুজ্‌ঝটিকা ত্যাগ করিলে হয় ত সে বৎসর আর কুজ্‌-ঝটিকা না পাওয়ায় তোমাকে অনেক ক্ষতি স্বীকার করিতে হইবে। এমন সময়ে ছোলা বোনা উচিত যে, দক্ষিণে বাতাস প্রবাহিত হওয়ার পূর্ব্বেই তাহার কুসুমোদ্গম শেষ হয়, নচেৎ ভাল ফল হয় না। সকল প্রকার শস্যের বীজ যথাকালে সংগ্রহ করিয়া রাখা উচিত নতুবা উপযুক্ত সময়ে বপন বা রোপণের ব্যাঘাত ঘটে। সংগ্রহ সময়ে বীজ সকল উত্তম রূপে পরীক্ষা করিয়া লওয়া উচিত। কোন্ বীজ নূতন, পুরাতন, অপক্ক, রুগ্নবৃক্ষজাত, পোকা ধরা ইত্যাদি দেখিয়া শুনিয়া লওয়াই বীজ পরীক্ষা। উত্তম রূপে পরিপুষ্ট নূতন বীজই প্রয়োজনীয়। এমন অনেক বীজ আছে, যাহা বহু বৎসরের পুরাতন হইলেও নষ্ট হয় না। যেমন পলাণ্ডু, শিম, মূলা ইত্যাদি। মধ্যে মধ্যে শস্য বীজ ও ক্ষেত্রের পরিবর্ত্তন করা আবশ্যক।

---

# সপ্তম পাঠ।

## কৃষিপরাশর।

"কৃষি-পরাশর" নামে এক খানি সংস্কৃত গ্রন্থ আছে। এই গ্রন্থে, এদেশীয় সর্ব্বপ্রধান শস্য ধানের বিষয় লিখিত হইয়াছে। অনুষঙ্গতঃ এই গ্রন্থে বিবিধ উপদেশ প্রদত্ত হইয়াছে। এই অধ্যায়ে তাহার সার সংগৃহীত হইবে।

"কৃষি-পরাশর" কত কালের গ্রন্থ তাহা পাঠকবর্গের স্বতঃই জানিতে ইচ্ছা হইতে পারে। পরাশরের জীবিত কালানুসারে

উহা তিন সহস্রাধিক বৎসর পূর্ব্বে প্রণীত হইয়াছে, এরূপ অনুমান করা যায়। এই গ্রন্থের প্রথম উনত্রিশটী শ্লোকে গ্রন্থকারের জয় প্রার্থনা, গ্রন্থের মঙ্গল সূচনা, কৃষিকার্য্যের শ্রেষ্ঠত্ব, কৃষকের গৌরব, অতিথি সেবার উপকার, রাজা, মন্ত্রী, মেঘ, বৃষ্টি, হস্তী, সরীসৃপ, বায়ু ইত্যাদির জ্ঞান কিরূপে হইতে পারে, ইহাদের ফলাফলই বা কি ইত্যাদি বিষয় বর্ণিত আছে।

এই গ্রন্থের ত্রিংশ শ্লোকে এই রূপ কথিত হইয়াছে যে, পৌষ মাসকে যদি বার ভাগ করা যায়, তাহা হইলে তাহার এক এক ভাগে আড়াই দিন করিয়া হইবে এবং প্রত্যেক ভাগকে যথাক্রমে পৌষ, মাঘ, ফাল্গুন ইত্যাদি গণনা করিবে। পৌষ মাসের ঐ সকল ভাগের যে যে ভাগে বৃষ্টি বা অনাবৃষ্টি হইবে, বৎসরের মধ্যে তত্তৎ সংখ্যক মাসেও বৃষ্ট্যাদির সেই রূপ ব্যবস্থা হইবে। যদি পৌষ মাসের তৃতীয় ভাগে জল হয়, তবে পৌষ হইতে তৃতীয় অর্থাৎ ফাল্গুন মাসেও বৃষ্টি হইবে। যদি অষ্টম ভাগে বৃষ্টি না হয়, তবে শ্রাবণ মাসে বৃষ্টি হইবে না। এ নিয়ম সত্য হইলে কৃষকগণের পক্ষে বিলক্ষণ সুবিধা হইতে পারে। এই নিয়ম যখন যত্ন করিলেই পরীক্ষা করা যায়, তখন উহা নিতান্ত কল্পিত হওয়া অসম্ভব। কিন্তু কাল সহকারে বাহ্য প্রকৃতির পরিবর্ত্তন হওয়াও অসম্ভব নহে, এই জন্য বর্ত্তমান কালে উক্ত নিয়ম সকলের ব্যতিক্রম হইলেও হইতে পারে।

পৌষ মাসে অতিশয় ধূলা হইলে এবং পশ্চিম দিকে বিদ্যুৎ কুজ্ঝটিকা বা বৃষ্টি হইলে আষাঢ় মাসে অধিক জল হইবার কথা আছে।

মাঘ মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় সপ্তমীতে বৃষ্টি কিম্বা মেঘোদয় হইলে, মাঘ এবং ফাল্গুনের শুক্ল সপ্তমীতে, চৈত্রের তৃতীয়ায় এবং বৈশাখের প্রথম দিনে প্রচণ্ড বায়ু প্রবাহ, বিদ্যুৎপ্রকাশ কিম্বা বৃষ্টি হইলে, সে বৎসর বৃষ্টির অবস্থা অতি উৎকৃষ্ট হয়।

যদি মাঘ মাসে নিরন্তর বৃষ্টি, ফাল্গুনে বায়ুপ্রবাহ, চৈত্রে আকাশ মেঘাচ্ছন্ন, বৈশাখে শিলাপাত ও জ্যৈষ্ঠে প্রচণ্ড রৌদ্র হয়, তাহা হইলে বর্ষার প্রারম্ভ হইতে কার্ত্তিক পর্য্যন্ত প্রচুর পরিমাণে বারিবর্ষণ হয়।

চৈত্র মাসের কৃষ্ণপক্ষীয় প্রতিপদে রবিবার হইলে অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হয়। ঐ দিন মঙ্গলবার হইলে ভাল রূপ বৃষ্টি হয় না; বুধ, বৃহস্পতি কিম্বা শুক্রবার হইলে সম্পূর্ণ শস্য হয়; এবং শনিবার হইলে সম্পূর্ণ রূপ অবৃষ্টি ও শুকা উপস্থিত হয়।

যদি জ্যৈষ্ঠ মাসে চিত্রা, স্বাতী ও বিশাখা নক্ষত্রে আকাশমণ্ডল মেঘশূন্য হয়, তবে শ্রাবণ মাসে ঐ সকল লক্ষণে বৃষ্টি হয়। কৃষিপরাশরে ইত্যাদি প্রকার সুবৃষ্টি, অতিবৃষ্টি, অনাবৃষ্টি প্রভৃতির বহুবিধ লক্ষণ নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে।

ইহার পর গ্রন্থকার কৃষি পর্য্যবেক্ষণ, কৃষির উপযুক্ত পশুপালন, সার প্রস্তুতীকরণ ও ভূমিতে ক্ষেপণ, কৃষিব যন্ত্রাদি, প্রথম হলকর্ষণের শুভদিন, হলপূজা, প্রথম কর্ষণের লক্ষণ, মাঘাদি মাসে হলকর্ষণের প্রাশস্ত্য, বীজসংগ্রহ, বপন, রোপণ, কাটান, ছেদন, এইগুলি এবং তাহাদের আনুষঙ্গিক আরও অনেকগুলি বিষয়ের বর্ণন করিয়াছেন। সে সকলের বাহুল্য বর্ণনে তাদৃশ ফলোদয়ের সম্ভাবনা নাই ভাবিয়া কেবল তৎসংক্রান্ত

দুই চারিটী কথা সংগ্রহ করিয়া এ অধ্যায় শেষ করিব। কিন্তু উপরি উক্ত অনুষ্ঠানগুলির কোন কোনটী কিয়ৎপরিমাণে রূপান্তরিত হইয়া, অদ্যাপি এদেশীয় কৃষকগণের মধ্যে প্রচলিত আছে।

পিতাকে অন্তঃপুরে, মাতাকে পাকশালায় এবং আত্মবৎ ব্যক্তিকে গো রক্ষণে নিযুক্ত করিবে, কিন্তু কৃষিকার্য্য পর্য্যবেক্ষণার্থ স্বয়ংই গমন করিবে।

যিনি উত্তম রূপে হালিক গোগণকে পালন ও স্বয়ং কৃষিক্ষেত্র সকল পরিদর্শন করেন, যথাকালে বীজ ও কৃষি কার্য্যোপযোগী বস্তু সকল সংগ্রহ করিয়া সর্ব্বদা সতর্কভাবে কালের প্রতি দৃষ্টি রাখেন, তাদৃশ কৃষক নিশ্চয়ই লাভবান হয়েন; তাঁহার কৃষিকার্য্য কখনই বিফল হয় না।

গোশালায় কাঁসার পাত্র, মাছ, কাঁসার পাত্র ধোয়া জল, কার্পাসের বীজ, তপ্ত মণ্ড, তুষ, সম্মার্জ্জনী, মূষল ও উচ্ছিষ্ট দ্রব্য রাখিলে এবং ছাগ বন্ধন করিলে গোরুর অনিষ্ট হয়।

বর্ত্তমান কালে কৃষকগণ লাঙ্গলে যেরূপ ফাল ব্যবহার করিয়া থাকেন, তাহার দৈর্ঘ্য এক হস্ত এবং বিস্তার চারি অঙ্গুলি পরিমিতও নহে। তদ্দ্বারা ভূমি উত্তম রূপে কর্ষিত হয় না। কৃষিপরাশরে ফালের দৈর্ঘ্য এক হস্ত কিম্বা এক হস্ত পাঁচ অঙ্গুলি এবং তাহার আকার আকন্দ পত্রাকার হইবে, এই প্রকার নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। ভূমি কর্ষণে এইরূপ ফাল ব্যবহৃত হওয়া উচিত; কিন্তু এই রূপ ফাল ব্যবহার করিতে হইলে অগ্রে গো জাতির উন্নতি বিধান করা কর্ত্তব্য। ঐ গ্রন্থের কোন স্থলে এই রূপ লিখিত হইয়াছে, বর্ষের প্রথম

জলপ্রবাহ কালে গোগণ যদি মলমূত্র ত্যাগ করে, তাহা হইলে মল ত্যাগে শস্য বৃদ্ধি এবং মূত্র ত্যাগে বন্যা হয়। এই নিয়মটীর কোন মূল আছে কি না, কৃষকগণের পরীক্ষা করিয়া দেখা উচিত।

বল্মীকের নিকট, গো-শালায়, সূতিকাগারে ও রন্ধনগৃহে শস্যের বীজ রাখিবে না এবং বন্ধ্যা, রজস্বলা, গর্ভিণী, নবপ্রসূতি ও অশুচি ব্যক্তি বীজ স্পর্শ করিবে না। বৃহস্পতি, শুক্র ও সোম এই তিন বারে বীজ বপন প্রশস্ত।

জ্যৈষ্ঠের শেষে কিম্বা আষাঢ়ের প্রথমে তিন দিন অম্বুবাচী বলিয়া খ্যাত; ঐ সময়ে সর্ব্বপ্রকার শস্যের বীজ বপন ও হলাদি কর্ষণ নিষিদ্ধ। এই সময়ে সচরাচর অধিক পরিমাণে বৃষ্টি হওয়াই এরূপ নিষেধের কারণ বলিয়া বোধ হয়। যেহেতু অধিক জলে বীজের অনিষ্ট হইয়া থাকে।

মাঘ মাসে গোময় ও সার শুষ্ক করিবে এবং তাহা ফাল্গুন মাসে ক্ষেত্রের নিকটে গর্ত্তমধ্যে প্রোথিত করিয়া রাখিবে; পরে বীজ বপন কালে শস্য-ক্ষেত্রে ছড়াইয়া দিবে (১)। কৃষি-পরাশরে শস্য ক্ষেত্রে সার দেওয়ার এই ব্যবস্থা আছে; কিন্তু এক্ষণে সার দান সম্বন্ধে বহুল মতামত উপস্থিত হইয়াছে। এই গ্রন্থের স্থলান্তরে তাহার উল্লেখ করা গিয়াছে।

---

(১) এই নিয়মটী সম্পূর্ণ বৈজ্ঞানিক, সার পর্য্যায়ে ইহার যুক্তি নির্দ্দেশ করা যাইবে।

## নবম পাঠ।

### কৃষিবিষয়ক প্রবাদ।

বঙ্গদেশে নানা বিষয়ে বহুতর প্রবাদ প্রচলিত আছে; তন্মধ্যে কতকগুলি কৃষিবিষয়ক। ঐ গুলিই এ দেশীয় কৃষি-কার্য্যের নেতা। সুতরাং কৃষক মাত্রেরই সেইগুলির সন্ধান লওয়া আবশ্যক। এই জন্য এই অধ্যায়ে কতকগুলি প্রয়োজনীয় কৃষি বিষয়ক প্রবাদ সংগৃহীত হইল।

"খাটে খাটায় লাভের গাঁতি
তার অর্দ্ধেক কাঁধে ছাতি,
ঘরে বোসে পুছে বাত
তার ঘরে হা ভাত।"

যদি নিরন্তর কৃষিক্ষেত্রে উপস্থিত থাকিয়া খাটিতে বা মজুরগণকে খাটাইতে না পার, ছাতি মাথায় দিয়া এক এক বার তদারক করিও; নতুবা কৃষিকার্য্যে ক্ষতি হইবে।

"কোদালে কুড়ুলে মেঘের গা,
এলো মেলো বহে বা।
শ্বশুরকে বল বাঁন্ধ্তে আল,
জল হবে আজ কাল।"

কোন্ সময়ে জল হইবে জানিতে পারিলে, কৃষিকার্য্যে অনেক সুবিধা হয়। এই জন্য কৃষকের মেঘ, বাতাস প্রভৃতি বাহ্য প্রকৃতির প্রতি বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। বিশেষতঃ এই প্রবাদের সঙ্কেতটী স্মরণ রাখা বিধেয়।

"স্রাওলা তাতে
চাসা মাতে।"

ধানের ছোট ছোট চারায় অধিক রৌদ্র লাগিলে কোন হানি হয় না; বরং উপকার হইয়া থাকে।

"থোড় ত্রিশে, ফুলো বিশে,
ঘোড়া মুখো বার;
ইহা বুঝে, শ্বশুর ঠাকুর
বেচা কেনা কর।"

থোড় হওয়ার ত্রিশ দিন পরে, ফুল হওয়ার বিশ দিন পরে, শিষ ঘোড়ামুখের আকারে ঝুলিয়া পড়িলে বার দিনের পর ধান পাকিয়া উঠে।

"শতেক চাসে মূলা,
তার অর্দ্ধেক তুলা;
তার অর্দ্ধেক ধান
বিনা চাসে পান।"

মূলার জমিতে অনেক চাস লাগে। পানের জমিতে বেশি চাস লাগে না বটে; কিন্তু সর্ব্বদা ভূমি পরিষ্কার থাকা আবশ্যক এবং উহার লতা প্রস্তুত করার অন্যান্য অনেক অনুষ্ঠান আছে।

"আট হাত অন্তর, এক হাত বাই,
কলা পোঁত গে চাসা ভাই
কলা পুঁতে না কেটো পাত
তাইতে কাপড়, তাইতে ভাত।"

কলা গাছ পোঁতার গর্ত্ত এক হাত গভীর করিবে। কলা পাত

কাটিলে কলা, মোচা ইত্যাদি সম্বন্ধে কিছু ক্ষতির সম্ভাবনা থাকিলেও, বোধ হয়, পাতা বেচার মূল্যে তাহার পূরণ হইতে পারে। প্রাচীন প্রবাদে কলার পাতা কাটা এক কালে কেন নিষিদ্ধ হইয়াছে বলা যায় না। কিন্তু বৃক্ষাদির কতকগুলি শাখা পত্র কাটিয়া না দিলে তাহার ফল মূল উত্তম হয় না, ইহা বিজ্ঞান সম্মত। তবে কলারবাইলের কিয়দংশ রাখিয়া কাটা উচিত; নতুবা কাণ্ডকোষ পচিয়া গিয়া সমস্ত বৃক্ষ নষ্ট হইবার সম্ভাবনা; বোধ হয়, এই কারণে এক কালেই কলার পাতা কাটা নিষিদ্ধ হইয়া থাকিবে।

"ফাগুনে আগুন চৈতে মাটি
বাঁশ ছেড়ে বাঁশের পিতামহ কাটি।"

ফাল্গুন মাসে বাঁশের গোড়ায় আগুন দিতে হয়; তাহাতে বাঁশের যাবতীয় অনাবশ্যক শুষ্ক মূল ও গোড়া পুড়িয়া গিয়া ঝাড়ের তেজ বৃদ্ধি করে। চৈত্র মাসে বাঁশের গোড়ায় পুকুর, ডোবা কিম্বা খাল বিল হইতে পলিমাটী উঠাইয়া দিতে হয়। বৎসরের মধ্যে যথারীতি এই দুইটী ক্রিয়া করিতে পারিলেই বাঁশের পাইট করা হয়। আর তিন বৎসরের ন্যূন বয়সের বাঁশ কাটা উচিত নহে।

"আষাঢ়ে রোয় ফলকে,
শ্রাবণে রোয় দলকে,
ভাদ্রে রোয় তুঁষকে
আশ্বিনে রোয় কিসকে।"

আসাঢ় মাস ধান্য রোপণের প্রশস্ত সময়। ঐ মাসে রোপণ করিতে পারিলে উত্তম শস্য হয়। শ্রাবণ মাসের রোপণে

গাছে পাতা বেশি হয়, ফল তাদৃশ হয় না। ভাদ্র মাসে রোইলে ধানে সাব হয় না, তুঁষ হয়। আশ্বিন মাসে রোইলে কিছু মাত্র শস্য হয় না।

"ধন্য রাজার পুণ্য দেশ,
যদি বর্ষে মাঘের শেষ।"

মাঘ মাসের শেষে বৃষ্টি হইলে চাসের বিলক্ষণ সুবিধা হয়, কারণ মাঘ মাস হইতেই জমিতে চাস দেওয়া আরম্ভ হয়। প্রচণ্ড শীতে ভূমি অত্যন্ত কঠিন হইয়া থাকে; মাঘ মাসে জল না হইলে জমিতে লাঙ্গল দেওয়া একরূপ কঠিন হইয়া উঠে।

---

## দশম পাঠ।

## কৃষি-বিজ্ঞান।

প্রথম অধ্যায়।

পূর্ব্বকালে এদেশের মৃত্তিকায় যে উর্ব্বরা শক্তি ছিল, সে জন্য পূর্ব্বতন কৃষকগণকে কৃষিকার্য্য সম্পাদন বিষয়ে অধিক শ্রম ও যত্ন করিতে হইত না; অল্পায়াসেই অধিক শস্য লাভে কৃতকার্য্য হইয়া পরম সুখে দিনপাত করিতে পারিত; এখন ভূমির সেই উৎপাদিকা শক্তি;—কৃষকের সেই সুখের অবস্থা কোথায় গেল?

এই প্রশ্নের উত্তরে একটু বৈজ্ঞানিক বিচারের প্রয়োজন। এই বিচারের অবতারণা না করিয়া ঐ প্রশ্নের উত্তর দান করিতে পারা যায়, কিন্তু বুঝাইতে পারা যায় না।

হিন্দু দর্শনিকগণের সিদ্ধান্ত এই যে, ক্ষিতি, অপ, তেজ,

মরুৎ, ব্যোম, মহত্তত্ব, মায়া ও পরা এই অষ্টধা প্রকৃতি সৃষ্টির মূল। তন্মধ্যে প্রথমোক্ত পাঁচটী ভূত; অর্থাৎ পঞ্চবিধ পৃথক পরমাণুর সমষ্টি। কিন্তু পাশ্চাত্য দার্শনিকগণ এই পাঞ্চভৌতিক মতবাদের খণ্ডন করিয়া পঞ্চষষ্ঠী ভূতপদার্থের অবতারণা করিয়াছেন। যথা—হরিতীন্, পুতীন্, ব্রোমাইন্, গন্ধক, উদজান, যবক্ষারজান, অম্লজান, কাব্বন্, পারদ, লৌহ, স্বর্ণ, তাম্র ইত্যাদি। এবিষয়ের বিশেষ জ্ঞান রসায়ন শাস্ত্র অধ্যয়ন সাপেক্ষ, এস্থলে তাহার বাহুল্য বর্ণন অনাবশ্যক। পাশ্চাত্য দার্শনিকেরা বলেন, হিন্দুর পাঞ্চভৌতিক মত অমূলক। কেননা তাঁহাদিগের কথিত পঞ্চভূতের একটীও প্রকৃত ভূত অর্থাৎ এক প্রকৃতিক পরমাণুর দ্বারা নির্ম্মিত নহে। প্রত্যক্ষ রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা স্থিরীকৃত হইয়াছে, ক্ষিতি, অপ্ ও মরুৎ এই তিনটি বহুবিধ পরমাণুর সমষ্টি। যাহাকে বিশুদ্ধ জল বলা যায়, তাহাও জলজান ও যবক্ষারজান্ নামক দুইটি ভূত পদার্থের যোগোৎপন্ন। অবশিষ্ট তেজ্ ও ব্যোম্ এই দুইটী পদার্থই নহে, তেজকে প্রাকৃতিক কার্য্য কহে। ব্যোম্ কিছুই নহে। যাহা দুই বা তদধিক ইন্দ্রিয়গ্রাহ্য, তাহাই জড় পদার্থ; যেমন জল, বায়ু, গো, অশ্ব ইত্যাদি। ইহারা দর্শন, স্পর্শ এই উভয় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য। এবং যাহা একটীমাত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য, তাহাই প্রাকৃতিক কার্য্য। যেমন আলোক, উত্তাপ, ছায়া, শব্দ ইত্যাদি। ইহারা হয় দর্শন, নয় স্পর্শ, নয় শ্রবণ ইত্যাদি একটীমাত্র ইন্দ্রিয় গ্রাহ্য যাহা কোন ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য নহে; কিন্তু উভয় ইন্দ্রিয়ের গ্রাহ্য, ইহা প্রমাণ হইতে পারে তাহাও জড়। যেমন, চন্দ্র, সূর্য্য, নক্ষত্র ইত্যাদি। যাহা হউক, কি

হিন্দু দার্শনিক, কি পাশ্চাত্য দার্শনিক, উভয়ের মতেই ভূত ও প্রাকৃতিক কার্য্যের সংযোগ ও বিয়োগে জগতীয় অনন্ত কোটি পদার্থের উৎপত্তি ও ধ্বংস স্বীকৃত হইয়াছে ; এবং এই উৎপত্তি ও বিনাশ ক্রিয়া নিয়তই চলিতেছে। ইহারই নাম সৃষ্টি প্রবাহ। কৃষিকার্য্য এই সৃষ্টি প্রবাহে বহমান একটী প্রধান প্রাকৃতিক ঘটনা।

উপরি উক্ত অনুচ্ছেদে যে উৎপত্তি ও বিনাশ শব্দের উল্লেখ করা হইয়াছে, তদ্দ্বারা এমন বুঝিতে হইবে না যে, এই সংসারে প্রতিনিয়ত নূতন পদার্থের সৃষ্টি হইতেছে এবং কোন কোন পদার্থ এককালে ধ্বংস পাইতেছে। কেননা পূর্ব্বে যে পরমাণুর নাম মাত্র গ্রহণ করা হইয়াছে, তাহার অনেকগুলি গুণ আছে। সে সমস্ত গুণের কথা এ প্রবন্ধে বলিতে হইবে না, কিন্তু দুই একটী বলিতে হইবে। তন্মধ্যে একটীর নাম অনশ্বরত্ব।

যে গুণ থাকাতে পরমাণু কোনকালে বিনষ্ট হয় না, তাহার নাম অনশ্বরত্ব। মনুষ্যের চক্ষে জড় পদার্থের যে ধ্বংস প্রকাশ পায়, তাহা প্রকৃত ধ্বংস নহে, জড়ের রূপান্তর বা প্রকারান্তর প্রাপ্তি মাত্র। পরমাণুর অনশ্বরত্ব গুণ বশতঃ "সজীব পদার্থ নির্জ্জীব হয় ; নির্জীব পদার্থ সজীব হয়।" কৃষিবিজ্ঞানের আলোচনায় ক্রমশঃ এ তত্ত্ব বিশদীকৃত হইবে।

পরমাণুর আর একটী প্রধান গুণের নাম আকর্ষণ। এই আকর্ষণ ত্রিবিধ। সংহতি, সংসক্তি ও সম্বন্ধ। যে গুণের প্রভাবে পরমাণু সকল পরস্পর আকৃষ্ট ও সম্বদ্ধ হইয়া ক্ষুদ্র ও বৃহৎ নানাবিধ জড়ের আকার ধারণ করে, তাহার নাম সংহতি। যে গুণের প্রভাবে নানাবিধ জড় পদার্থ পরস্পর আকৃষ্ট ও সম্বদ্ধ

হইয়া থাকে, তাহার নাম সংসক্তি। যেমন, জলে জল, দুধে দুধ, মাটীতে মাটী মিশিয়া যায় এবং কঠিন পদার্থের গাত্রে তরল পদার্থ লগ্ন হইয়া থাকে, ইত্যাদি। যে গুণের প্রভাবে বিভিন্ন প্রকার পরমাণু পরস্পর আকৃষ্ট, সম্বন্ধ ও মিলিত হইয়া রূপান্তর ও গুণান্তর প্রাপ্ত হয়, তাহার নাম সম্বন্ধ। যেমন পারদাণু ও গন্ধকাণু পরস্পর মিলিত হইয়া উভয়ের উজ্জ্বল শ্বেত ও পীতবর্ণ পরিত্যাগ পূর্ব্বক গাঢ় কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে। তাহার নাম কজ্জলি। ঐ কজ্জলিতে অগ্নি সংযোগ করিলে উহা কৃষ্ণবর্ণ পরিত্যাগ করিয়া গাঢ় লোহিতবর্ণ হিঙ্গুল রূপে পরিণত হয়। বিবিধ জীবে বিবিধ খাদ্য আহার করে। সেই আহার্য্য জীব কর্ত্তৃক উপভুক্ত হইয়া জঠরাগ্নি সহযোগে শোণিত, মাংস, মেদ, মজ্জা, অস্থি, মস্তিষ্ক ইত্যাদি রূপে পবিণত হইয়া জীবদেহ বর্দ্ধিত করে। পরমাণুর ঐ সম্বন্ধ গুণই তাহার মূলীভূত। এই সকল কথা যে শাস্ত্রের বিষয়, তাহার নাম রসায়ন বিদ্যা। এ স্থলে তাহার সম্যক আলোচনার সম্ভাবনা নাই, কেবল দিগ্‌দর্শন জন্য স্থানান্তরে তাহাকে স্পর্শ মাত্র করা যাইবে।

পরমাণুর আর কয়েকটী বিশেষ গুণ অর্থাৎ কৃষিবিজ্ঞানে যে সকল গুণের পরিচয় নিতান্ত আবশ্যক, তাহাদের নাম অন্তর্ব্বাহ, বহির্ব্বাহ, কৈশিকতা ইত্যাদি। দুইটী তবল পদার্থের মধ্যে যদি একটী অপেক্ষাকৃত ঘন হয়, এবং ঐ দুইটী তরল পদার্থের মধ্যে একটী সচ্ছিদ্র আবরণ থাকে, তাহা হইলে ঐ আবরণের মধ্য দিয়া তরল পদার্থটী অপেক্ষাকৃত ঘনটীর সহিত মিলিত হইবে। এই প্রবাহ কোন পদার্থের ভিতর হইতে বাহিরে

প্রবাহিত হইলে বহির্ব্বাহ এবং বাহির হইতে ভিতরে প্রবাহিত হইলে অন্তর্ব্বাহ নাম ধারণ করে।

কৈশিকতা,—সচ্ছিদ্রতা জড় পদার্থের একটী স্বতঃসিদ্ধ গুণ। এজন্য সকল পদার্থই সচ্ছিদ্র; কিন্তু ঐ সকল ছিদ্র এত সূক্ষ্ম যে চর্ম্ম চক্ষে প্রায় দেখা যায় না। তবে কোন কোন পদার্থের ছিদ্র কিছু স্থূল সহজে দেখা যায়। যেমন পদ্মাদি জল কুসুমের মৃণাল, বরফ, স্পঞ্জ ইত্যাদি। যাহা হউক, পদার্থ শাস্ত্রে জড়ের ঐ সকল ছিদ্র সচরাচর কেশের সহিত উপমিত হইয়া থাকে। পরমাণুর যে গুণ থাকাতে জলীয় পদার্থ সকল জড়ের সদৃশ সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্র মধ্য দিয়া বাহিত হইয়া থাকে, তাহার নাম কৈশিকতা। ঐ কৈশিকতা দ্বিবিধ। কৈশিক উন্নতি ও কৈশিক অবনতি। তরল পদার্থের সহিত কঠিন পদার্থের সংসক্তি গুণের অভাব ও সদ্ভাব বশতঃই যথাক্রমে কৈশিক উন্নতি ও কৈশিক অবনতি হইয়া থাকে। পদার্থের কেশবৎ সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া তরল পদার্থের ঊর্দ্ধ-গতি হইয়া থাকে, তাহার প্রমাণ বর্ষাকালে অনেক স্থলে দৃষ্ট হইয়া থাকে। যাঁহারা পাকা বা কাঁচা ঘরের নিম্ন তলে বাস করিয়া থাকেন, তাহারা সেই গৃহের চতুঃপার্শ্বস্থ ভিত্তি প্রতি দৃষ্টিপাত করিলে দেখিতে পাইবেন, নিম্নস্থ জল ঐ ভিত্তির অভ্যন্তরে সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া ঊর্দ্ধগামী হইতেছে। এইরূপেই শুষ্ক ভিত্তি আর্দ্র হয়, ঘরের মেজ্যা "ড্যাম্প" হয়। এই কৈশিকতা গুণ আশ্রয় করিয়াই প্রদীপ জ্বলে, বাতী পুড়ে, আর্দ্র বস্ত্র শুষ্ক হয়, জলাশয় হইতে জলীয় বাষ্প উঠিয়া গগনমণ্ডল মেঘাচ্ছন্ন করে এবং এই প্রবন্ধের প্রধান অঙ্গীভূত তরুলতার ভূগর্ভস্থ মূল শিকড়ের অগ্রভাগ হইতে অগ্রশাখাস্থিত ফলফুলে রসসঞ্চার হইয়া থাকে।

গুরুত্ব ও শ্রেষ্ঠত্বাংশে পৃথিবীতে এমন পদার্থ কিছুই নাই, বোধ হয়, যাহার সহিত মৃত্তিকার তুলনা হইতে পারে। মৃত্তিকাই সকলের মূল,—মৃত্তিকাই জগৎ সৃষ্টি ও রক্ষার নিদান। অন্ন, ব্যঞ্জন, দুগ্ধ, ঘৃত, ননী, মাখন, মিঠাই, মতিচুর, সন্দেশাদি মিষ্টান্ন, পরিপক্ক ফল-মূল-কন্দাদি সুখাদ্য উদ্ভিদ, মৃত্তিকাই সকলের মূল। এমন কি মৃত্তিকাকে জীবের জীবন বলিলেও অত্যুক্তি হয় না;—সেই মৃত্তিকাকে আমরা কি ভাবে দেখি? সকলের অধম, সকলের নিকৃষ্ট! কোন পদার্থকে হেয় ও নীচ বলিয়া প্রকাশ করিতে হইলে মাটীর সহিত তুলনা করি! কোন দ্রব্যের দর কমিয়া গেলে তাহাকে 'মাটীর দর' বলিয়া উল্লেখ করি। ভাবিয়া দেখিলে বুঝা যায়, সংসারে এমন কোন সুখ বা সৌকর্য্যের সামগ্রী নাই, যাহার সহিত মৃত্তিকার প্রত্যক্ষ বা পরোক্ষ সম্বন্ধ না আছে। এতাদৃশ অমূল্য বা মহামূল্য রত্ন যে মৃত্তিকা, তাহার প্রতি আমাদের এত অনাদর বুদ্ধি কেন? অর্থশাস্ত্রেব নিয়মানুসারে এ প্রশ্নের উত্তব না দেওয়া যাইতে পারে, তাহা নহে; কিন্তু সে বিচার বিতর্ক তুলিয়া মৃত্তিকার লাঘব বা প্রবন্ধের কলেবর বৃদ্ধি করিবার ইচ্ছা নাই।

তরু, তৃণ, গুল্ম, লতা, শৈবাল, ছত্রাক প্রভৃতি যত প্রকার উদ্ভিদ্ দৃষ্ট হইয়া থাকে, মৃত্তিকা মধ্যে তাহাদিগের পোষণীশক্তি অদৃষ্টভাবে নিহিত আছে। এমন কি তরুরুহ (পরগাছা) সকল, যাহা প্রত্যক্ষরূপে মৃত্তিকার উপর জন্মে না;—পাদপগণের উপরিভাগে অবস্থান পূর্ব্বক বৃক্ষের পরিপক্ক রসাকর্ষণ করিয়া জীবন ধারণ করে, তাহাদিগের পোষণী

শক্তিও পরোক্ষ ভাবে মৃত্তিকামধ্যে আছে। যে জাতীয় উদ্ভিদ্ মৃত্তিকার উপর জন্মে, সেই জাতীয় উদ্ভিদের শরীর পোষণার্থ যে সকল পদার্থের প্রয়োজন, সেই সকল উদ্ভিদ্ আপন আপন কোমল মূল সকলের অগ্রভাগ দ্বারা মৃত্তিকা হইতে রসরূপে সেই সকল পদার্থ গ্রহণ করিয়া থাকে। মৃত্তিকার এমনি মহীয়সী ও ঐন্দ্রজালিকী শক্তি যে, যদি এক কাঠা ভূমির উপর লক্ষাধিক প্রকার ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ বপন বা রোপণ করা যায়, মৃত্তিকা সেই লক্ষাধিক প্রকার উদ্ভিদেরই শরীর পোষণোপযোগী ভিন্ন ভিন্ন প্রকার সামগ্রী প্রদান করিবে। কিন্তু একজাতীয় উদ্ভিদ পুনঃ পুনঃ এক ভূমিতে আবাদ করিলে, ঐ ভূমিতে ঐ জাতীয় উদ্ভিদ পোষণোপযোগী পদার্থ নিঃশেষ হয় বা একেবারে কমিয়া যায়। এই জন্য ভূমিতে ঐ পদার্থের পুনঃ সংস্থান নিমিত্ত উপায়ান্তর অবলম্বন করিতে হয়। এই উপায়ের নাম ভূমিতে সার দেওয়া। এই সারাধান কার্য্য দ্বিবিধ; স্বাভাবিক ও কৃত্রিম। ভূমিতে উপর্য্যুপরি ২।৩ বৎসর কোন শস্যের আবাদ না করিয়া ভূমি ফেলিয়া রাখিলে মৃত্তিকা, জল, বায়ু, উত্তাপ হইতে আপনিই লুপ্ত বা হৃত পদার্থ পুনঃ সংগ্রহ করিয়া থাকে। ইহারই নাম স্বাভাবিক সারাধান। কৃষকেরা যথাকালে যথাপরিমাণে নানাবিধ পদার্থ সার রূপে ভূমির মৃত্তিকা সহ মিশ্রিত করিয়া দেয়; ইহার নাম কৃত্রিম সারাধান।

ভূমিতে কোন্ কোন্ দ্রব্যের চাস করিলে ভূমি হইতে কোন্ কোন্ পদার্থের অভাব হয়, প্রথমে তাহাই ঠিক করিতে হইবে। কোন্ কোন্ বস্তু সার রূপে ভূমিতে প্রদান করিলে,

সেই সকল দ্রব্যের পুনরায় সদ্ভাব হইতে পারে, পরে তাহা নির্ণয় করিতে হইবে। এই বৈজ্ঞানিক প্রণালীতে ভূমিতে সার দিতে পারিলে প্রতি বৎসরই এক ভূমি হইতে ইচ্ছামত নানাবিধ দ্রব্যের চাস আবাদ করা যাইতে পারে। এক মৃত্তিকার মধ্যে অনন্ত উদ্ভিদের অনন্ত উপাদান থাকায় ভূমিতে সার না দিয়াও এক ভূমি হইতে প্রতি বৎসর ভিন্ন ভিন্ন ফসল উৎপাদন করা যাইতে পারে, তাহার একটী উৎকৃষ্ট উপায় আছে। তাহাও একটী শিক্ষা ও পরীক্ষার বিষয়। তাহার নাম শস্যপর্য্যায়। এই বিষয়টী পৃথক পাঠে লিখিত হইয়াছে।

এই প্রবন্ধের প্রথম অংশে কয়েকটী বৈজ্ঞানিক শব্দের উল্লেখ করিতে হইয়াছে, যথা সংহতি, সংসক্তি, সম্বন্ধ, অনশ্বরত্ব, অন্তর্ব্বাহ, কৈশিকতা, সচ্ছিদ্রতা ইত্যাদি। কৃষি ও উদ্যান কার্য্যের সহিত জড়ের ঐ সকল গুণগ্রামের কি সম্বন্ধ, এক্ষণে পরিষ্কার রূপে তাহার আলোচনা করা আবশ্যক।

জীব সামান্যতঃ দ্বিবিধ। স্ফুট-চৈতন্য এবং অস্ফুট-চৈতন্য। উদ্ভিদ্ সকল শেষোক্ত প্রকার জীব শ্রেণীর অন্তর্গত। যথাকালে যাহাদিগের জন্ম, বৃদ্ধি ও হ্রাস হয়, তাহারাই জীব। উদ্ভিদ্ জন্মে, মূল, ত্বক ও পত্র দ্বারা জল, মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে আহার গ্রহণ পূর্ব্বক বৃদ্ধি প্রাপ্ত হয়, এবং কাল সহকারে মরিয়া যায়। উদ্ভিদ্ সকল মৃত্তিকাদি হইতে স্ব স্ব শরীর পোষণার্থ যে যে পদার্থ গ্রহণ করে, তাহা পরমাণু বা তদ্বৎ ক্ষুদ্র আকারে গৃহীত হয়। জড়ের সংহতি শক্তি বশতঃই তাহা ক্রমশঃ সংহত ও ঘনীভূত হইয়া বৃহৎ আকার

ধারণ করে। সর্ষপবৎ বটবীজ, যোজনব্যাপী বৃক্ষরূপে পরিণত হয়, সংহতি শক্তিই তাহার প্রধান কারণ।

জল, বায়ু, মৃত্তিকা, আলোক, উত্তাপাদি উদ্ভিদের বীজ, মূল, ত্বক, পত্রাদির সহিত সংসক্ত হয় বলিয়াই উদ্ভিদের সৃষ্টি ও পুষ্টি হইয়া থাকে। পরমাণুর ঐ সংসক্তি গুণ না থাকিলে উদ্ভিদের কোন অংশের সহিত জলাদির সংযোগ হইত না এবং সেই সংযোগের অভাবে উদ্ভিদের সৃষ্টিই অসম্ভব হইত।

মনুষ্য বা পশ্বাদির মৃত্যু হইলে তাহাদের দেহ ভস্মীভূত বা গলিত হইয়া মৃত্তিকাসাৎ হইয়া যায়। সেই ভস্মে বা সেই মৃত্তিকায় মৃতজীবের দেহাণু অবশ্যই রূপান্তরিত হইয়া থাকে। যে ভস্মে বা যে মৃত্তিকায় মৃত জীবের দেহবিশেষ রূপান্তরিত হইয়া থাকে, সেই ভস্ম ও সেই মৃত্তিকা কৃষিক্ষেত্রের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। সেই সার দ্বারা ক্ষেত্র প্রস্তুত করিয়া তাহাতে কোনরূপ শস্যের আবাদ করিলে সে শস্যের বৃক্ষ ও ফল-মূলাদি অপেক্ষাকৃত সতেজ ও পরিপুষ্ট হইয়া থাকে। পরমাণুর সম্বন্ধ গুণ প্রভাবেই জীবদেহাবশেষ, উদ্ভিদের অঙ্গ-প্রত্যঙ্গ-ফল-ফুলাদিরূপে পরিণত হয়।

উদ্ভিদ্ আপন শরীর পোষণোপযোগী পদার্থ, মূল, নবীন ত্বক্ ও নবীন পত্র দ্বারা জল, বায়ু, মৃত্তিকা হইতে গ্রহণ করে, এ কথা পূর্ব্বে কয়েকবার উল্লেখ করা হইয়াছে, কিন্তু ঐ সকল পদার্থ কোথা হইতে কিরূপে আসিয়া জলাদিতে কি ভাবে অবস্থান করে, একবারও সে কথার উল্লেখ করা হয় নাই। একটী জীব বা উদ্ভিদ্ শরীর ভস্মীভূত করিলে, আপাত

দৃষ্টিতে বোধ হয়, তাহার সকলই সর্ব্বভুক্‌ অগ্নি ভক্ষণ করিয়া ফেলিল,—কিঞ্চিৎ ভস্ম ব্যতিরেকে আর সকলই নষ্ট হইয়া গেল। কিন্তু পরমাণুর অনশ্বরত্ব গুণ প্রভাবে তাহার একটী অণুও নষ্ট হইতে পায় না। কোন পদার্থ দগ্ধ হইতে আরম্ভ হইলে তাহার জলীয়াংশ বাষ্পীভূত হইয়া বায়ুর সহিত মিশিয়া থাকে, যথাকালে নবীন ত্বক্‌ ও পত্রের ছিদ্র দ্বারা উদ্ভিদ্‌ দেহে প্রবেশ করে। জলীয়াংশের কতকটা মৃত্তিকাস্থ জলের সহিত জলাকারেই মিশিয়া যায়। কঠিনাংশ ভস্ম হইয়া মৃত্তিকার সহিত মিশিয়া থাকে। তাহাই আবার মূল দ্বারা উদ্ভিদ্‌ শরীরে প্রবেশ করে। কোন বস্তু পচিতে আরম্ভ হইলেও তাহার পরিণাম প্রায় এইরূপ। জলীয়াংশের কতক বায়বীয় ভাব ধারণ করিয়া বায়ুর সহিত, কতক জলাকারে জলের সহিত, অবশিষ্ট মৃত্তিকার আকারে মৃত্তিকার সহিত মিলিত হইয়া থাকে। এইরূপেই জল, বায়ু, মৃত্তিকার মধ্যে উদ্ভিদ্‌ পোষণ পদার্থের সংস্থান ও অবস্থান হইয়া থাকে। যথাকালে উদ্ভিদ্‌ সকল তাহা গ্রহণ করিয়া আপনার শরীর রক্ষা ও ফলফুল প্রসব করে। পরমাণুর অশ্বনরত্ব গুণ প্রভাবে "সজীব পদার্থ নির্জীব হয়, এবং নির্জীব পদার্থ সজীব হয়।" এই কথা এতক্ষণে স্পষ্ট বুঝা গেল। জীব, উদ্ভিদ্‌ শরীরে প্রবেশ করিয়া নির্জীব হইতেছে এবং উদ্ভিদ, জীব-শরীরে প্রবেশ করিয়া সজীব হইতেছে।

উদ্ভিদ্‌ সামান্যতঃ দ্বিবিধ। একবীজদল এবং দ্বিবীজদল। একবীজদল উদ্ভিদের মূলশিকড় নাই, তাহার শিকড় সূক্ষ্ম ও গুচ্ছাকার। যেমন ধান্য, যব, গম, গুবাক,

নারিকেল, খর্জ্জুর, তাল, ইত্যাদির মূল এবং দ্বিবীজদল উদ্ভিদের মূলশিকড় আছে, তাহা ক্রমশঃ দ্বৈভাগিক প্রণালীতে বিভক্ত হইয়া অধিক মৃত্তিকার নিম্নে গমন করে। যেমন সর্ষপ, তিসি, ছোলা, কলায়, মটর, আম্র, কাঁটাল, ইত্যাদির মূল। বীজের অঙ্কুরোদ্গম্ কালে যাহা হইতে একটী মাত্র পত্র বহির্গত হয়, তাহার নাম একবীজদল এবং ঐ কালে যাহার একত্র দুইটী পত্র বহির্গত হয়, তাহার নাম দ্বিবীজদল উদ্ভিদ্। এই দুই প্রকার উদ্ভিদের মূলেই বহুসংখ্য সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম কোমল শিকড় বহির্গত হয়। ঐ সকল সূক্ষ্ম শিকড়ের অগ্রভাগ অধিকন্তর কোমল ও একপ্রকার সচ্ছিদ্র পাতলা ত্বকে আবৃত। মৃত্তিকা মধ্যে যে উদ্ভিদ্ পোষণ পদার্থ থাকে, তাহা মৃত্তিকাস্থ জলের সহিত মিলিত হইয়া পরমাণুর অন্তর্ব্বাহ শক্তি প্রভাবে উপরি-উক্ত পাতলা ত্বকের ছিদ্র দিয়া উদ্ভিদের মধ্যে প্রবেশ করে। যখন অনাবৃষ্টি হয়, বা কোনরূপে উদ্ভিদের মূলে জল সেচন ক্রিয়া রুদ্ধ হয়, তখন মৃত্তিকা শুষ্ক হইলে তন্মধ্যস্থ রস বা জলাংশ উদ্ভিদ শরীরস্থ রসাপেক্ষা ঘন হয়। তখন পরমাণুর বহির্ব্বাহ শক্তির কার্য্য আরম্ভ হয়। অর্থাৎ উদ্ভিদের অন্তর্গত রস উপরি উক্ত ত্বকের ছিদ্র দিয়া বহির্গত হইয়া মৃত্তিকাস্থ অপেক্ষাকৃত ঘন রসের সহিত মিলিত হয়। জলাভাবে শস্যাদি নষ্ট হইবার বৈজ্ঞানিক প্রথম সূত্র এইরূপ।

মৃত্তিকার রস কিরূপে উদ্ভিদ্ শরীরে প্রবেশ করে, তাহা পূর্ব্বানুচ্ছেদে দেখান হইয়াছে। যদি পরমাণুর কৈশিকতা শক্তি না থাকিত, তাহা হইলে মৃত্তিকার রস উদ্ভিদের মূলে প্রবেশ করিয়া মূলেই অবস্থান করিত, সর্ব্বতঃ সঞ্চারিত হইয়া তাহার

কোন ইষ্ট সাধন করিতে পারিত না। কৈশিকতার বলে সেই রস, কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা, পত্র, মুকুল, ফুল, ফলাদিতে প্রবেশ করিয়া তাহাদিগের রক্ষা ও পুষ্টি সাধন করে। উদ্ভিদ্ শরীরে কৈশিক উন্নতি ভিন্ন অবনতি দৃষ্ট হয় না—তাহার স্থল স্বতন্ত্র।

মৃত্তিকারস উদ্ভিদ্দেহে প্রবেশ করে,—উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গে গতাগতি করে, এ কথা বলা হইয়াছে; কিন্তু, কি উপায়ে গতা-গতি করে, তাহা এখনও দেখান হয় নাই। সকল পদার্থই সচ্ছিদ্র,—অর্থাৎ চক্ষুর অগোচর, সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম ছিদ্রবিশিষ্ট। মৃত্তি-কার রস উদ্ভিদ্ শরীরে প্রবেশ করিয়া ঐ সকল ছিদ্র পথে তাহার সর্ব্বাঙ্গে গমনাগমন করে। উদ্ভিদের পুরাতন ত্বক্ পত্রাপেক্ষা তরুণ ত্বকপত্রে ছিদ্র অধিক ও পরিষ্কার। মূলের দ্বারা যে রস প্রবেশ করে, তাহা যেমন কাষ্ঠ, ত্বক্ ও পত্রের ছিদ্র দ্বারা সর্ব্বাঙ্গে সঞ্চারিত হয়, তেমনি ত্বক্ ও পত্রের ছিদ্র দ্বারা বায়ু ও জল হইতেও কোন কোন পদার্থ উদ্ভিদ্ মধ্যে প্রবেশ করে।

# একাদশ পাঠ।

## কৃষি বিজ্ঞান।

### দ্বিতীয় অধ্যায়।

উদ্ভিদ দেহ যে সকল উপকরণে গঠিত, তন্মধ্যে দশটি প্রধান। ভূমি এবং বায়ু হইতে উদ্ভিদ এই সকল বস্তু আকর্ষণ করিয়া লয়। নাইটারজান, পোটাশিয়ম এবং ফস্‌ফোরস্‌ ভিন্ন আর সকলই খুব সুলভ। নাইটারজানাদি পদার্থ ত্রয়ের প্রায়ই অভাব হয়। উদ্ভিদের প্রাণ আছে। পত্র ও মূল তাহার মুখ। পত্রদ্বারা বায়ু হইতে যে সকল বস্তু আকর্ষণ করে, তজ্জন্য কাহারও সহায়তা আবশ্যক হয় না, কিন্তু মূল দ্বারা আকৃষ্ট বস্তুনিচয়ের মধ্যে নাইটারজানাদি তিনটী উপকরণের সচরাচর অভাব হয় এবং উদভিদের তাহা পাইবার জন্য অন্যের সাহায্য আবশ্যক। পুনঃ পুনঃ একই শস্য কোনও ভূমিতে বপন করিলে, তত্রত্য নাইটারজানাদি সেই শস্য কর্তৃক আকৃষ্ট হইয়া ক্ষয় প্রাপ্ত হইতে থাকে, কোনও উপায়ে ভূমিতে যদি তাহা প্রত্যর্পিত না হয়, সময়ে তাহার লোপ হইবার সম্ভাবনা।

ভূমি যে সকল বস্তুর মিশ্রণে উৎপন্ন হয়, তাহাদের মধ্যে নাইটারজান্‌, ফস্‌ফোরস্‌, ক্ষারজান, চূণ, বালি, এটেল, রোদ-মাটী প্রভৃতি প্রধান। উদ্ভিদ যত কেন পেটুক হউক না, নাইটারজানাদি তিনটী পদার্থ ভিন্ন আর কোনটীকেই খাইয়া নিঃশেষ করিতে পারে না। সকল মাটীতেই এই সকল পদার্থ যথাপরিমাণে থাকে, তাহা নহে। কোন মাটীতে বালির ভাগ বেশী, কোন মাটীতে এটেলের ভাগ বেশী, কোন মাটীতে বা

অন্য পদার্থ অধিক। মাটীর উর্ব্বরতার জন্য এই সমুদয় পদার্থের যথাপরিমাণ সমাবেশ নিতান্ত আবশ্যক। যে মাটীতে বালির ভাগ বেশী, তাহাতে জল তিষ্ঠে না, রৌদ্র হইলে অতি শীঘ্র উত্তপ্ত হইয়া পড়ে, সুতরাং তাহাতে ফসল জন্মায় না। এঁটেল মাটীর দোষ এই, তাহাতে জল দাঁড়াইয়া যায়, মাটী অত্যন্ত শীতল হইয়া পড়ে; সুতরাং শস্যোৎপত্তির ব্যাঘাত ঘটে। বেলে-মাটীতে এঁটেল, এবং এঁটেল মাটীতে বালি না মিশাইলে ভাল শস্য উৎপন্ন হয় না। তদ্রূপ যে ভূমিতে পচা উদ্ভিদ বা চূণ খুব বেশী, অন্যান্য পদার্থ যোগ করিয়া তাহাও উৎকৃষ্ট মাটীতে পরিণত করা যায়। এঁটেল, বালি, চূণ এবং বোদ মাটি প্রভৃতি যথাপরিমাণে থাকিলেই ভূমি উর্ব্বরা হয় না; উপ-যুক্ত পরিমাণে নাইটারজানাদিও থাকা আবশ্যক। তদ্ভিন্ন ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থাও কৃষির উপযুক্ত হওয়া চাই। ভূমিতে যথা পরিমাণ জল দাঁড়ান, উপযুক্ত পরিমাণে উত্তাপ থাকা প্রভৃতি অবস্থা বিশেষই প্রাকৃতিক অবস্থা শব্দের বাচ্য। এই সকল ঘটনার একত্র সম্মিলন না হইলে, ভূমি উর্ব্বরা হয় না। বিবে-চনা করিয়া দেখিলে এই সমুদয়ই মনুষ্যের সাধ্যায়ত্ত।

এঁটেল, বালি, বোদমাটী এই তিনটী দ্রব্য যথা পরিমাণে ভূমিতে মিশাইয়া দেওয়া অতি সহজ ব্যাপার; তাহা বোধ হয়, অতি নির্ব্বোধ কৃষকও করিতে পারে। চূণের ভাগ স্বভাবতই উপযুক্ত পরিমাণে থাকে, তজ্জন্য কাহাকে বিশেষ কোন উপায় অবলম্বন করিতে হয় না, আর হইলেও এদেশে তদ্বিষয়ে লোকের অভিজ্ঞতা না থাকাতে কোন সুফলের আশা নাই। তৎপর নাইটারজানাদির যথাযোগ্য ব্যবস্থা করিতে পারিলেই

সুকৃষক হওয়া যায়। ভূমির প্রাকৃতিক অবস্থা যে অনুকূল হওয়া আবশ্যক, তাহা কৃষকেরা বেশ জানে, তৎসম্বন্ধে তাহাদিগকে বেশী কিছু না বলিলেও চলে। পূর্ব্বেই বলা হইয়াছে, একাদিক্রমে বার বার একই শস্য কোন ক্ষেত্রে বপন করিলে সময়ে তাহার সোরাজানাদি নষ্ট হইয়া যায়। এই ক্ষতি পূরণ করিতে হইলে, গোবর, খৈল, দাম, হাড় প্রভৃতি সার ভূমিতে মিশ্রিত করিয়া দেওয়া আবশ্যক। এতভিন্ন আরও অনেক সার আছে, কিন্তু এদেশে তাহাদের প্রচলন নাই। ধান, গম, যবাদি শস্যে নাইটারজান প্রধান সার প্রয়োজনীয়; ছোলা, মুগ, মটর, মসুর প্রভৃতি শস্যে ফস্‌ফোরস্‌ ও পোটাসিয়ম প্রধান সারের প্রয়োজন। কেবল সার ক্ষেতে দিলেই উদ্দেশ্য সম্পন্ন হয় না। উপযুক্ত সময়ে উপযুক্ত অবস্থাতে, যথাপরিমাণ সার দিলেই যাহা কিছু লাভের আশা করা যায়। গোবরে ফস্‌ফোরস্‌, পোটাসিয়মের অংশ কিছু বেশী, সুতরাং ইহারা সিম্বি জাতীয় শস্যেরই অধিক উপকার করে। খৈল, দাম প্রভৃতি গমজাতীয় শস্যের বিশেষ উপযোগী। উদ্ভিদ ভূমি হইতে আকর্ষণ করিয়া এই সমুদয় পদার্থ নিজ দেহে আনয়ন করে; অন্যান্য জীবের ন্যায় উদ্ভিদ কঠিন বস্তু খাইতে পারে না, তাহার খাদ্যদ্রব্য মাত্রই জলীয় অণুতেপরিণত হইয়া শিকড়ের আশে পাশে অবস্থান করা আবশ্যক। এইরূপ অবস্থা হইলে উদ্ভিদ্ চুষিবা মাত্র তাহা স্বীয় দেহে আনিতে থাকে। ইহা হইতে সহজেই জানা যায়, যে সে অবস্থায় সার দিলে উদ্ভিদের কোন উপকার হয় না। কেন হয় না, আর একটু স্পষ্ট করিয়া বলিতেছি। সারের মধ্যে নাইটারজানাদি পদার্থ মিশ্রাবস্থায় থাকে। মলিন বস্ত্র

হইতে ধুলা কালী প্রভৃতি পৃথক করিতে হইলে যেমন তাহা জলে সিদ্ধ করিতে হয়, কঠিন পদার্থে আছড়াইতে হয়, তদ্রূপ গোবর খৈল প্রভৃতি হইতে নাইটারজানাদি স্বতন্ত্র করিতেও প্রণালী বিশেষ অবলম্বন করিতে হয়। সেই জন্য শস্য বপন করিবার সঙ্গে সঙ্গেই যদি ক্ষেত্রে কাঁচা গোবর দেওয়া হয়, তাহাতে কোনই লাভ হয় না। কোনও ভূমিতে সার দিতে হইলে এরূপ সময়ে দেওয়া উচিত যে, চারা অঙ্কুরিত হইয়া বড় হইতে হইতে তাহা পচিয়া যেন মৌলিক উপাদান গুলিকে পৃথক্ পৃথক করিয়া দেয়। মৌলিক উপাদান অর্থাৎ নাইটারজানাদি বিভিন্ন হইয়া জলীয় অণুতে পরিণত হইলে চারার পুষ্টিসাধন অতি সহজেই হইতে থাকে। পচা গোবর ব্যবহার করাই অনেক সময় সুবিধা জনক। কিন্তু যে সার যে রূপেই ব্যবহৃত হউক না, যথাসময়ে উদ্ভিদের আহার যোগাইতে পারিলেই হইল। সারের ব্যবহারের প্রধান উদ্দেশ্য সোরাজানাদির অভাব পূরণ করা। প্রাকৃতিক অবস্থাও ভাল রাখে।

---

# দ্বাদশ পাঠ।

## সার।

সার নানা প্রকার। ভিন্ন ভিন্ন শস্যের পক্ষে ভিন্ন ভিন্ন সার আবশ্যক। কোন্ শস্যে কি প্রকার সার আবশ্যক, কোন্ মৃত্তিকার সহিত কোন্ প্রকার সার স্বভাবতঃ মিশ্রিত আছে, এবং কোন্ প্রকার মাটীতে কোন্ প্রকার সার দেওয়ার প্রয়োজন, এ সকল বিষয়ে সম্যক্ জ্ঞান লাভ করা সহজ ব্যাপার নহে। সাহেবদের দেশে যাঁহারা প্রকৃত রূপ কৃষক হইতে ইচ্ছা

করেন, তাঁহাদিগকে রসায়ন, উদ্ভিদ্‌বিদ্যা ও কৃষি বিষয়ক নানাবিধ শাস্ত্র অধ্যয়ন করিতে হয়। আমাদের দেশে অদ্যাপি সেরূপ প্রথা হয় নাই। সুতরাং মৃত্তিকা পরীক্ষা ও শস্য ক্ষেত্রে সার দান সম্বন্ধে বিলক্ষণ বিশৃঙ্খলা আছে। তবে আজ কাল এদেশ হইতে কেহ কেহ কৃষিশিক্ষার্থ বিলাত গমন করিতেছেন। দুই চারিজন কৃষিশাস্ত্রে পণ্ডিত হইয়াও আসিয়াছেন। এদেশের কৃষি বিষয়ক উন্নতি তাঁহাদিগের উপর অনেকটা নির্ভর করিতেছে।

এদেশীয় কৃষকগণের মৃত্তিকার গুণাগুণ বিষয়ে কিছু স্থূল জ্ঞান আছে এইমাত্র। মৃত্তিকা পরীক্ষা করিবার কোন উপায় এ দেশীয় কৃষকগণের জানা নাই। মৎস্য পুরাণে মৃত্তিকা-পরীক্ষার একটা উৎকৃষ্ট উপায় দৃষ্ট হয়। কৃষক যে ভূমিতে যে শস্য বপন করিতে ইচ্ছা করেন, সেই ভূমির কিয়দংশ লাঙ্গল দ্বারা কর্ষণ করিয়া অভিপ্রেত শস্যের কিঞ্চিৎ বীজ সেই কর্ষিত ভূমিতে বপন করিবেন। ঐ বীজ যদি তিন রাত্রির মধ্যে অঙ্কুরিত হয়, তবে সেই ভূমিকে উত্তম, পাঁচ রাত্রির মধ্যে অঙ্কুরিত হইলে মধ্যম এবং সাত রাত্রির মধ্যে অঙ্কুরিত হইলে অধম বলিয়া গণ্য করিবেন। এই ত্রিবিধ ভূমিই কৃষিকার্য্যার্থ গ্রহণ করা উচিত। যে ভূমিতে বীজ অঙ্কুরিত হইতে ইহা অপেক্ষাও অধিক সময় লাগে, কৃষকের সে ভূমি পরিত্যাগ করাই শ্রেয়ঃ। "ব্যবসায়ী"তে মৃত্তিকা পরীক্ষার একটী বিলাতী পদ্ধতি লিখিত হইয়াছে; কিন্তু তাহা কৃষিশিক্ষা-পাঠকগণের পক্ষে সহজ পাঠ্য নহে। এজন্য তাহা এ স্থলে উদ্ধৃত হইল না। এই জগতের

প্রায় যাবতীয় পদার্থই অন্যান্য পদার্থের সংযোগে উৎপন্ন। উদ্ভিদ্‌গণও বিবিধ পদার্থের সমষ্টি। কোন্ উদ্ভিদে কোন্ কোন্ পদার্থ আছে, তাহা জানিয়া ভূমি বিশেষে শস্য বিশেষ রোপণ করিতে হয়। অথবা যেখানে যে শস্য রোপণ করা যায়, যে জিনিসে সেই শস্যের অংশ আছে, তথায় সেই জিনিস সাররূপে দিতে হয়। শস্যের পুষ্টির জন্য যে সকল দ্রব্যের প্রয়োজন, ভূমিতে যদি তাহা উপযুক্ত রূপে না থাকে, তবে ভূমির সেই অভাব পূরণ করিয়া দিতে হয়। ভূমির এইরূপ অভাব পূরণের নামই সার দেওয়া। এদেশে এরূপ বিবেচনা করিয়া সার দেওয়া হয় না; প্রাচীন পরম্পরায় সার দেওয়ার যেরূপ প্রথা আছে, অধুনাতন কৃষকগণ তাহারই অনুকরণ করিয়া থাকেন। এ গ্রন্থে কিয়ৎ পরিমাণে ঐ প্রথার সংশোধন এবং কয়েকটী নূতনবিধ সারের উল্লেখ করা যাইবে।

যে ক্ষেত্রের মৃত্তিকা স্বভাবতই অনুর্ব্বরা, তাহা যদি কোন রূপে পোড়ান যায়, তাহা হইলে বিলক্ষণ উর্ব্বরা হইয়া উঠে। কোটা, প্রাচীর, পাকা রাস্তার উপর তৃণ গুল্মাদি যে সতেজে বৃদ্ধি পায়, তাহা সচরাচর দেখা যায়। কারণ মৃত্তিকাতে বালুকা, রসাতিশয্য প্রভৃতি যে সকল অনুর্ব্বরতাজনক পদার্থ থাকে, অগ্নি সংযোগে রাসায়নিক পরিবর্ত্তন সহকারে তাহারা মৃত্তিকাকে উর্ব্বরা করিয়া তুলে।

সকল প্রকার শস্যের বীজেই এমন এক প্রকার পদার্থ (১) আছে, যদ্দ্বারা তাহার অঙ্কুরের উৎপত্তি ও কিয়ৎকালের

(১) এল্‌ব্যুমেন (Albumen)।

জন্য পুষ্টি হইতে পারে। তবে উৎপত্তি কালে উপযুক্ত রূপ জল, বায়ু ও তাপের সাহায্য আবশ্যক। তজ্জন্য কৃষককে অধিক চেষ্টা করিতে হয় না; যাহাতে বীজ সকল অব্যাঘাতে জল, বাতাস ও রৌদ্র পায়, কেবল তদনুরূপ ব্যবস্থা করিলেই চলিতে পারে। কিয়ৎকাল পরে যখন অঙ্কুরের মূল মৃত্তিকার রসাদি আকর্ষণে সমর্থ হয়, বোদমাটী (১), এটেল মাটী ও বালি এই তিনেব সম পবিমাণ মিশ্রণে যে মাটী প্রস্তুত হয়, তখন যদি সেই মাটী পায, তাহা হইলে সর্ব্ব প্রকার চারাই উৎকৃষ্ট রূপে বৃদ্ধি পাইতে পাবে। বীজ বপন বা রোপণেব পূর্ব্বেই ক্ষেত্রে ঐরূপ মাটী দিতে পারিলে ভাল হয়। কিন্তু সুবিস্তৃত ওষধি ক্ষেত্রের সর্ব্বত্র ঐরূপ সার মাটী দিতে পাবা সহজ নহে। এই জন্য আমবা প্রস্তাব করি, যে সকল স্থানে অধিককাল স্থায়ী ফুল ও ফলেব বীজ (২) রোপণ করিতে হইবে, কেবল সেই সকল স্থানেই গর্ত্ত করিয়া ঐরূপ সার মাটী দেওয়া উচিত।

শুদ্ধ বালি ও শুদ্ধ কর্দ্দমে অধিকাংশ উদ্ভিদ্‌ই জন্মিতে পারে না। কিন্তু ঐ দুই পদার্থ অন্য মাটীর সঙ্গে মিশ্রিত হইলে উত্তম সাবের কার্য্য করে। কারণ ঐ দুই দ্রব্যে উদ্ভিদের পুষ্টিকর যে যে পদার্থ আছে, তাহা অন্য মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত

(১) বোদ মাটীতে অধিক পবিমাণে অঙ্গার অম্ল ও যবক্ষারজান আছে।

(২) সকল প্রকাব পুবাতন বীজই হুঁকাব জল, চূণেব জল, কিম্বা শুদ্ধ জলে ২।৩ দিন ভিজাইযা বাখিবে। পরে নেক্‌ড়া বাঁধিয়া এক দিন টাঙ্গাইয়া রাখিবে। তাহার পর ঘুঁটেব ছাইয়ের গুঁড়া মাখাইয়া ২।১ দিন রাখিলে শীঘ্র অঙ্কুরিত হইবে।

হইলে অধিক পোষণোপযোগিতা প্রাপ্ত হয়। এমনও দুই একটী উদ্ভিদ্ আছে, যাহারা শুভ্রবর্ণ বিশুদ্ধ বালির উপর জন্মিতে পারে; কিন্তু তাহাদের সংখ্যা অতি অল্প। যথা পাতর-কুচি ও তজ্জাতীয় দুই একটা উদ্ভিদ্।

জল, চূণ, অস্থি-চূর্ণ, খৈল, সোরা, পশু পক্ষ্যাদির মলমূত্র, পলিমাটী, বোদমাটী, ফাসমাটী, জলের দাম ইত্যাদি বহুবিধ পদার্থকে সার কহিয়া থাকে। কিন্তু এদেশে কেবল মাত্র জল, গোবর, বোদমাটী এবং কদাচিৎ অল্প পরিমাণে সর্ষপ বা তিসির খৈল সার রূপে ব্যবহৃত হইয়া থাকে।

পৃথিবীতে প্রায় এমন কোন শস্য নাই, যাহা জল ব্যতিরেকে হইতে পারে। কারণ অম্লজান এবং উদজান এই দুইটী রূঢ় পদার্থের সংযোগে জল উৎপন্ন হইয়াছে। ঐ দুইটী পদার্থই উদ্ভিদের উপকারী (১)। বিশেষতঃ মৃত্তিকাস্থ অন্যান্য উপাদান জল দ্বারা দ্রবীভূত হইয়া উদ্ভিদের শোষণোপযোগী হইয়া থাকে। এই জন্য জলই সর্ব্বপ্রধান সার-রূপে পরিগণিত হয়। কিন্তু নদী বা কূপাদির জলাপেক্ষা বৃষ্টিবারি উদ্ভিদের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এই জন্য বড় বড় বৃক্ষের চারা সকল বর্ষাকালে রোপণ করাই প্রশস্ত। যে সকল শস্য বৃষ্টিবারির অপেক্ষা করে না, তাহারাও বায়ুমধ্যগত বাষ্পজাত শিশির প্রচুর পরিমাণে না পাইলে বাঁচিতে পারে না। শিশির ও বৃষ্টিবারির উপাদান একই প্রকার।

চূণ ও হাড়ের কুচি সকল প্রকার শস্যে আবশ্যক হয় না। যদি আটাল মাটীতে কোনরূপ শস্য জন্মান আবশ্যক হয়,

(১) ৯ ভাগ জলে ৮ ভাগ অম্লজান এবং এক ভাগ উদজান আছে।

তবে সেই ক্ষেত্রে ঐ দুই সার দিতে পারিলে ভাল হয়। কারণ ঐ দুই সারে মৃত্তিককে শিথিল করিয়া রাখে। হাড়ের কুচি ইক্ষু ও চা ক্ষেত্রের বিশেষ উপযোগী। এখন সর্ব্বত্রই ইউরোপীয়দিগকে গরাস্থি সংগ্রহ করিতে দেখা যায়। তাহার অধিকাংশই চূর্ণীকৃত হইয়া চা-ক্ষেত্রে প্রেরিত হয়। অস্থি ধূলিবৎ চূর্ণ করিয়া ভূমিতে দিতে পারিলেই ভাল হয়; কিন্তু এ দেশে অস্থি চূর্ণ করিবার কোন উপায় নাই। অস্থি দগ্ধ করিলে অঙ্গার হয়, অধিক পোড়াইলে ভস্মও হইতে পারে; তখন উহাকে চূর্ণ করা সহজ হয় বটে; কিন্তু অগ্নি সংযোগে অস্থি হইতে উদ্ভিদ্ পোষণ পদার্থের অধিকাংশই নষ্ট হইয়া যায়।

চূণ প্রত্যক্ষ সম্বন্ধে উদ্ভিদের কোন উপকার করে না, কিন্তু পরম্পরা সম্বন্ধে চারি প্রকারে বিশেষ উপকার করিয়া থাকে।

১। মৃত্তিকাকে শিথিল ও সছিদ্র করিয়া উদ্ভিদ্ মূল প্রসারণের উপযোগী করে।

২। মৃত্তিকাস্থ অম্ল সকল নষ্ট করিয়া লৌহ ঘটিত পদার্থ সকলকে কোমল করিয়া দেয়।

৩। মৃত্তিকাস্থ রস পরিমাণের লাঘব করিয়া পোষক পদার্থ সকলকে উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিয়া দেয়।

৪। খনিজ পদার্থ (১) প্রভৃতির ক্ষয় সাধন করে।

প্রায় সকল প্রকার শস্যেই খৈলের গুঁড়া ব্যবহার করা যাইতে পারে। এ দেশে কেবল ইক্ষু-ক্ষেত্রে অল্প পরিমাণে

---

(১) যে সকল খনিজ উদ্ভিদের অনিষ্ট করে।

খৈল ব্যবহার করা হইয়া থাকে। তাহাও আবার সর্ষপ কিম্বা মসিনা-খৈলই অধিক, রেড়ির খৈল অতি অল্প পরিমাণে ব্যবহৃত হয়। সর্ষপ ও মসিনা অপেক্ষা রেড়ি, পোস্ত, কার্পাস-বীজ ইত্যাদির খৈলই কৃষি কার্য্যের বিলক্ষণ উপযোগী। গঙ্গার পশ্চিম পারস্থ কৃষকেরা গোল আলুর চাসে রেড়ির খৈল ব্যবহার করে; এই জন্য তাহাদের আলু অধিক বড় হয় এবং উৎপন্নও এদেশ অপেক্ষা বেশি হইয়া থাকে। প্রতি বিঘায় অন্যূন এক মণ খৈল দেওয়া আবশ্যক। শস্য ক্ষেত্রে খৈল এরূপে ছড়ান উচিত যেন, অধিক মাটির নীচে না যায়। সর্ব্বপ্রকার খৈলই যে সারের কার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার কারণ এই, খৈলে পটাস, ম্যাগনেসিয়া, চূণ, ফস্‌ফরিক-অম্ল, যবক্ষারজান ইত্যাদি বহুবিধ রূঢ় পদার্থের সংযোগ আছে। ঐ সকল রূঢ় পদার্থ প্রায় সমস্ত উদ্ভিদেরই পুষ্টিকর (১)।

---

(১) কোন পদার্থ অগ্নিতে দগ্ধ করিলে তাহার কিয়দংশ বাষ্পাকারে বায়ুর সহিত মিশ্রিত হয় এবং অবশিষ্ট ভস্মাকার ধারণ করে। দগ্ধ পদার্থের যে ভাগ বায়বাকার প্রাপ্ত হয়, তন্মধ্যে অম্লজান, উদজান, অঙ্গার-অম্ল ও যবক্ষারজানই অধিক। ঐ সমস্তগুলিই উদ্ভিদের উপকারী এবং উদ্ভিদ্‌গণ ঐ সকল পদার্থ প্রায়ই বায়ু হইতে গ্রহণ করে। ভস্মে পটাসাদি বহুবিধ উদ্ভিদ্‌-পোষণ পদার্থ থাকে। যদি সরিষা, তিসি, পোস্তদানা এবং কার্পাস-বীজ এই কয়টি শস্যের খৈলের প্রত্যেকের ৬।০ মণ দগ্ধ করা যায়, তাহা হইলে গড়ে প্রত্যেকের ।৬৮০ সের ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। ঐ পরিমিত ভস্মে গড়ে /৪।০ সের পটাস /১।৶ ম্যাগ্নিসিয়া, /২।৶ চূণ এবং /৬॥৶ ফস্ফরিক অম্ল থাকে, ইহা রাসায়নিক পরীক্ষা দ্বারা নিঃসংশয়িত রূপে স্থিরীকৃত হইয়াছে।

পশু পক্ষ্যাদির মলমূত্র হইতে যে সকল সার জন্মে তাহা সকল প্রকার শস্যে ব্যবহার করা যাইতে পারে। মনুষ্যের মলমূত্র জাত সারই সর্ব্ব প্রধান, "পরে পক্ষী, তার পর মেষ, শূকর, ঘোড়া ও সকলের পরে গোরুর (১)।" মেষের বিষ্ঠাপেক্ষা গোরুর বিষ্ঠা নিকৃষ্ট সার হইবার যুক্তি ভাল বোঝা যায় না। কারণ গোরুর ও মেষের প্রত্যেকেরই চারিটী পাকস্থলী এবং অন্যান্য শরীর প্রভৃতি ঠিক এক রূপ। বিশেষতঃ গোময় জাত সারে এ দেশীয় প্রায় যাবতীয় শস্যই উত্তম রূপে উৎপন্ন হইতে দেখা যায়। অথচ রাসায়নিক পরীক্ষায় স্থির হইয়াছে যে, অশ্ব, শূকর ও মেষ ইহাদিগের বিষ্ঠাপেক্ষা গোময়ের দাহ্য-ভাগে যবক্ষারজান পদার্থ অতি অল্প পরিমাণে দৃষ্ট হয়। জন্তুর মলমূত্রের অন্তর্গত ঐ যবক্ষারজান পদার্থই উদ্ভিদের বিশেষ ইষ্টকর। কিন্তু গোময়ের ভস্মে অঙ্গার-অম্ল, পটাস, ম্যাগ্‌নিসিয়া, চূণ, অস্থিসার প্রভৃতি উদ্ভিদ্ পোষণ প্রায় সকল পদার্থই বিদ্যমান আছে। মনুষ্যের মল মূত্র জাত সার প্রস্তুত করা কিম্বা ভূমিতে দেওয়া দূরে থাকুক, উহার আন্দোলনেও আমরা ঘৃণা

---

গোধূম, যব, ধান্য, সর্ষপ, তিসি, ছোলা, কলায়, মসুর এই শস্যগুলির প্রত্যেককে উপরিউক্ত পরিমাণে দগ্ধ করিলে গড়ে তাহাদের /৯৸৹ সের ভস্ম অবশিষ্ট থাকে। ঐ ভস্মে গড়ে পটাস /৫৷৹, ম্যাগ্নিসিয়া /৸৹, চূণ /৷৹ এবং ফস্ফরিক অম্ল /৩ সের পাওয়া যায়। খৈল যে কেন সার রূপে ব্যবহৃত হয় হিসাব দৃষ্টে তাহা সহজেই বোধ হইবে।

(১) এই সকল প্রাণীর মল ও মূত্রের সহস্র ভাগে যথাক্রমে নিম্নলিখিত রূপ যবক্ষারজান আছে, মনুষ্য—১৪—১০, শূকর—৬—৩, মেষ—৭—১৪, অশ্ব—৫—১২,—গো—৩৮।

বোধ করি। এই ঘৃণা যে আমাদের অজ্ঞতামূলক, তাহাতে সন্দেহ নাই। যে ক্ষেত্রে লোকে এ বৎসরে মল মূত্র ত্যাগ করিতেছে, সেই ক্ষেত্রে আর বৎসর বড় বড় বেগুন ও মূলা তৈয়ার হইতেছে। তাহা কি আমরা খাই না? তবে মল মূত্র জাত সারে ঘৃণা কেন? মনুষ্যের মল মূত্র জাত সার হইতে উৎপন্ন শস্য সকল যখন সকলকেই ব্যবহার করিতে হয়, তখন কৃষি কার্য্যে তাদৃশ সর্ব্বোৎকৃষ্ট সার (১) ব্যবহার করিতে বিমুখ থাকা কাহারও উচিত নহে।

অনেক জেলখানায় পরীক্ষা দ্বারা স্থির হইয়াছে যে, মল মূত্র মিশ্রিত মৃত্তিকা অতি উৎকৃষ্ট সার। এখানকার কৃষকেরা যে জমিতে আবাদ করিবার ইচ্ছা করেন, তাহা মধ্যে মধ্যে দুই এক বৎসর সকলকে যদি মল ত্যাগার্থ ছাড়িয়া দেন, তাহা হইলেও কিয়ৎ পরিমাণে উপকার হয়। পশ্চিম দেশে এ প্রথা প্রচলিত আছে, তত্রত্য কৃষকেরা আপন আপন আবাদি জমিতে মল মূত্র ত্যাগার্থ যত্নপূর্ব্বক অন্যান্য লোকদিগকে আহ্বান করে। লক্ষ্ণৌ প্রভৃতি স্থানের কৃষকেরা মিউনিসিপ্যাল কমিসনারদিগের নিকট হইতে পায়খানার মল ক্রয় করিয়া আপনাদিগের ক্ষেত্রে দেয়। ঠিক এরূপ ব্যবহার এদেশে কোন কালেই প্রচলিত হইবে কি না বলা যায় না। তবে ক্ষেত্রে মলত্যাগ করানর প্রথা সহজেই প্রবর্ত্তিত হইতে পারে। দুই এক বৎসর জমি ফেলিয়া রাখার প্রথা থাকায়, পূর্ব্বে ঐ উদ্দেশ্যটী কার্য্যতঃ কিয়ৎ

(১) মনুষ্যের বিষ্ঠায় যবক্ষারজান পদার্থ বা য়্যামোনিয়া সর্ব্বাপেক্ষা অধিক। তাহাতে অন্যান্য যাবতীয় উদ্ভিদ্‌-পোষণ পদার্থও আছে। এই জন্যই উহা উৎকৃষ্ট সারের মধ্যে গণ্য।

পরিমাণে সিদ্ধ হইত। এক্ষণে কৃষিক্ষেত্রের পরিমাণ অল্প হওয়ায় সেরূপে ঐ উদ্দেশ্য সিদ্ধ হওয়ার উপায় নাই। তবে কৃষকগণ ঐ সারের গুণ বুঝিতে পারিলে কোন না কোন রূপে তাহার ব্যবস্থা করিতে পারেন। কিন্তু মল শুষ্ক মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত না হইলে বিশেষ ফল হয় না। শুনা যায়, পূর্ব্ব-কালে ভারতীয় ব্রাহ্মণগণকে অনুদয়ে শয্যা ত্যাগ করিয়া বাস-স্থান হইতে কিছু দূরে গমন পূর্ব্বক নির্জ্জন প্রদেশে মৃত্তিকা খনন করিয়া তন্মধ্যে মল ত্যাগ করিতে হইত। ইহা দ্বারা স্বাস্থ্যরক্ষার নিয়ম পালন এবং ভূমির তেজোবৃদ্ধি করণ উভয়ই সম্পন্ন হইত। ভারতে এক কালে ব্রাহ্মণই সকল জাতির আদর্শ ছিলেন। এই জন্য সমস্ত বিধিব্যবস্থা ব্রাহ্মণকে লক্ষ্য করিয়াই প্রদত্ত হইয়াছে। পক্ষী, মেষ, ঘোড়া ও শূকর ইহাদিগের মল মূত্রে যে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইতে পারে, বোধ হয়, এ দেশীয় কৃষকগণ আদৌ তাহা অবগতই নহেন। কোন কোন দ্বীপ ও পর্ব্বতবাসী গুয়েনো নামক সামুদ্রিক পক্ষী বিশেষের মলে এমন উৎকৃষ্ট সার (১) প্রস্তুত হয় যে, ইউরোপীয় কৃষকগণ বার্ষিক বহু অর্থ ব্যয় করিয়া যত্নপূর্ব্বক তাহা আনিয়া স্বদেশস্থ কৃষি-ক্ষেত্রে প্রদান করিয়া থাকে। চূর্ণ ঘটিত লাবণিক পদার্থ, যবক্ষারজান, প্রভৃতি অধিক পরিমাণে থাকায় পক্ষিমলে এত উত্তম সার প্রস্তুত হয়। এদেশের কোন্ কোন্ পক্ষীর মলে সার হইতে পারে, তাহার সন্ধান লওয়া আবশ্যক।

---

(১) গুয়েনোর মলকেও গুয়েনো কহে। শত ভাগ গুয়েনোয় ১৫ ভাগ যবক্ষারজান আছে।

সম্প্রতি স্কট্‌লণ্ডে মনুষ্যের মল হইতে সার প্রস্তুত করিবার এক সুন্দর প্রণালী আবিষ্কৃত হইয়াছে। তথায় পায়খানার মল লইয়া যে জল বাহির হয়, তাহা একেবারে নদী বা সমুদ্রে না পড়িয়া একটা অপর স্থানে সঞ্চিত হয়। পরে ফট্‌কিরি, কয়লা, মাটি, রক্ত চূর্ণ উত্তমরূপে গুঁড়া করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিতে হয়। এই প্রক্রিয়ায় উহার সারভাগ নীচে পড়ে, জল-ভাগ নির্ম্মল ও গন্ধশূন্য হইয়া জলাশয়ে পতিত হয়। সারভাগ শুষ্ক করিয়া ভূমিতে দেওয়া হয়। ইহা গম, জৈ, যবাদি ফসলের পক্ষে বিশেষ উপকারী। এক মণের মূল্য ৩৲ টাকা, প্রতি বিঘায় ২ হইতে ৭ মণ পর্য্যন্ত ব্যবহার করিতে হয়।

পলিমাটি ও বোদমাটী এই দ্বিবিধ পদার্থই সকল প্রকার শস্যের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার হইতে পারে। জল চতুর্দ্দিকের ভূমি ধৌত করিয়া কোন নিম্ন স্থানে আসিয়া অবস্থিতি করে, তাহার নিম্নে যে মাটী সঞ্চিত হয়, তাহাকেই পলল বা পলিমাটী কহে। ইহা সর্ব্বপ্রকার উদ্ভিদেরই তেজ বৃদ্ধি করে। গঙ্গার পূর্ব্বপারস্থ নদীয়া ও ২৪ পরগণার কৃষকেরা কেবল মাত্র পলি-মাটী দ্বারা উত্তমরূপে গোল আলু ও কপি প্রস্তুত করিয়া থাকে। পলল দুই প্রকার, মাটী ও বালি। পদ্মার প্লাবনেই অধিক বালি থাকে। কৃষি কার্য্যে আরও একরূপ মৃত্তিকা ব্যব-হৃত হইয়া থাকে, তাহাকে ক্ষাসমাটী কহে। গোরু ও ঘোড়ার মল একত্র মৃত্তিকার সহিত মিশ্রিত হইয়া ও পচিয়া ঐ মাটী তৈয়ার হয়।

কূপ বা পুষ্করিণী খনন কালে ৫।৬ হাত মাটীর নিম্নে একটী কালো মৃত্তিকার স্তর দেখা যায়, তাহাকেই বোদমাটী কহিয়া

থাকে। উদ্ভিদ সকল বহুকালে পচিয়া ঐ রূপ মৃত্তিকা হইয়া যায় ( ১ )। বোদমাটী উদ্ভিদ্ পচিয়া হয় বলিয়াই উহা উদ্ভিদের পক্ষে অত্যন্ত উপকারী। সকলেই অবগত আছেন যে, নূতন পুষ্করিণী খনন করিয়া তাহার ধারে তোলা মাটীর উপর যে বাগান করা যায়, তাহার বৃক্ষাদি অতি সতেজ হইয়া থাকে; বোদমাটীই তাহার কারণ। বোদমাটীর প্রথমাবস্থায় অর্থাৎ যখন উদ্ভিজ্জগণ উত্তমরূপে না পচিয়া গিয়াছে, তখন উহা দ্বারা বিশেষ উপকার হয় না, বরং কিছু অনিষ্ট হইয়া থাকে। ঐ মাটীদিলে গাছের গোড়ায় উই ধরে। বিশেষতঃ সে অবস্থায় উদ্ভিদ্গণ বোদমাটী হইতে পোষক পদার্থ গ্রহণ করিতে পারে না।

এদেশের জলাশয় সকলে বহুতর দাম আপনিই জন্মিয়া থাকে। সেই সকল দাম যত্নপূর্ব্বক সংগ্রহ করিয়া পচাইতে ও শুষ্ক করিতে হয়। পরে যথাকালে ক্ষেত্রে দিলে ধান, পাট ইত্যাদি ফসলের বেশ উপকার করে। পূর্ব্বদেশীয় কৃষকেরা ঐ সার ব্যবহার করিয়া বিশেষ উপকার পায়।

অতঃপর দুই প্রকার মিশ্র সারের উল্লেখ করা যাইবে। গো-মূত্র, খৈলের গুঁড়া এবং যেখানে গোবর পচে তথাকার মাটী একত্র মিশাইলে উত্তম সার হয়। সকল প্রকার জন্তুর প্রস্রাব কিছু দিন পচাইয়া চতুর্গুণ জলের সহিত মিশাইলে শিথিল মাটীর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার হয়। (২)

---

(১) এই প্রণালীতেই মৃদঙ্গার স্তর নির্ম্মিত হইয়া থাকে।

(২) পচা বস্তু মাত্রেই অধিক পরিমাণে অঙ্গার-অম্ল ও যবক্ষারজান থাকে। এই জন্যই পচা বস্তু সকল সারের কার্য্য করে।

মাঘ ও ফাল্গুন মাসই সার দিবার উপযুক্ত সময়। কিন্তু যে সকল ভূমিতে হৈমন্তিক শস্য প্রস্তুত করিতে হয়, তাহাতে ভাদ্র মাসের শেষে সার দেওয়া উচিত। কারণ হৈমন্তিক শস্যের প্রায় সমস্তই আশ্বিন কিম্বা কার্ত্তিক মাসের মধ্যে বপন বা রোপণ করিতে হয়। মাঘ ফাল্গুনে সার দিলে প্রবল বর্ষায় তাহা ধৌত হইয়া যাইতে পারে।

ইউরোপের কৃষকেরা যেরূপ প্রণালীতে সার রক্ষা করেন এবং তদর্থে যেরূপ যত্ন ও যেরূপ ব্যয় স্বীকার করিয়া থাকেন, এদেশীয় কৃষকেরা সারের জন্য ততদূর করিবার প্রয়োজনই স্বীকার করেন না। এদেশীয় ভূমির অবস্থা এককালে এরূপ ছিল, যখন সারের জন্য তাদৃশ যত্ন না করিলেও চলিত। কিন্তু এখন আর সে কাল নাই। এখন উপযুক্ত সার যথেষ্ট পরিমাণে ভূমিতে প্রদান না করিলে, পর্য্যাপ্ত শস্যাদি লাভের উপায়ান্তর নাই। এই জন্য সার রক্ষা করিবার একটী সহজ উপায় প্রস্তাবিত হইতেছে। এদেশীয় কৃষকেরা বাটীর নানা স্থান হইতে গোবর ও ওঁচলা মাটী কুড়াইয়া সার রূপে শস্য ক্ষেত্রে প্রদান করেন। সে সারের অধিকাংশ উদ্বায়ী প্রয়োজনীয় পদার্থ (১) নষ্ট হইয়া যায়। অতএব সার মাটী প্রস্তুত ও রক্ষা করিবার জন্য একটু যত্ন করা আবশ্যক। সার মাটী বলিলে, গোবর, ভস্ম, গোমূত্র, তৃণপত্র, ভূমির উপরিস্থ মৃত্তিকা ইত্যাদি একত্র মিশ্রিত ও গলিত হইয়া যে সার প্রস্তুত হয়, তাহাকেই বুঝিতে হইবে। এই সার, সকল শস্যের পক্ষেই উপকারী এবং অন্যান্য সারাপেক্ষা অধিক সুলভ। এই সার প্রস্তুত করিবার

(১) যবক্ষারজান, অঙ্গার অম্ল ইত্যাদি।

জন্য গোশালার নিকটে ৫। ৬ হাত গভীর কূপের ন্যায় একটী গর্ত্ত খুঁড়িয়া রাখিতে হয়। ঐ গর্ত্তের তলভাগে এঁটেল মাটী দিয়া উত্তমরূপে দুরমুস্ করিতে হয়। গোশালার যাবতীয় গোমূত্র ইহাতে গড়াইয়া আসিতে পারে, এই জন্য গোয়ালের মেজের সহিত সংযুক্ত করিয়া একটী নালা কাটিয়া রাখা আবশ্যক। প্রতিদিন ঐ গর্ত্তে গোবর, ভস্ম, গোয়াল ও উঠান ঝাঁইট দেওয়ার আবর্জ্জনা নিঃক্ষেপ করিবে এবং উহাতে জল না পড়ে এমত ব্যবস্থা করিবে (২)। ইহাকে "সারকুড়" কহা যাইতে পারে। অভিজ্ঞ কৃষকেরা বলিয়া থাকেন, যাহার সারকুড় পূর্ণ থাকে, কালে শস্য দ্বারা তাহার গৃহও পূর্ণ হয়। উহাতে মধ্যে মধ্যে কিঞ্চিৎ চূণ দিয়া নাড়িয়া রাখিতে পারিলে ভাল হয়। পরে যথাকালে ঐ গর্ত্ত হইতে সার মাটী তুলিয়া শস্য ক্ষেত্রে ছড়াইয়া জমিতে চাস দিবে। এই মাটী শস্য বপনের কিছুকাল পূর্ব্বে ক্ষেত্রে প্রদান করিলে বায়ু হইতে উদ্ভিদ-পোষণ কোন কোন পদার্থ গ্রহণ করিবার অবসর পায়। কিন্তু ঐ মাটী হইতে আবার কোন কোন প্রয়োজনীয় পদার্থ বাষ্পাকারে উড়িয়া যাইতেও পারে। বোধ হয়, এই কারণেই

---

(২) ইউরোপের কোন কোন কৃষক গো ও অশ্বশালার মধ্যেই সার ছড়াইয়া রাখেন। তাহা ক্রমাগত পশুগণের পদাঘাতে জমাট বাঁধিয়া যায়। ঐ সারের বেধ কখন কখন চারি ফুটেরও অধিক হইয়া থাকে। তাহাতে পশুগণের কোন অনিষ্ট হয় না; অথচ সার উৎকৃষ্ট অবস্থায় থাকে। যাঁহারা সার স্তূপাকার করিয়া রাখেন, তাঁহারা উহার উপর এমন সকল পদার্থের আবরণ প্রদান বরেন, যাহাতে সারের কোন হানি না হয়। কোন কোন স্থলে প্রায় "সার কুড়ের" প্রণালীতেই রাখা হইয়া থাকে।

"কৃষি পরাশরে" সার মাটী ক্ষেত্রের নিকট পুতিয়া রাখিবার ব্যবস্থা আছে ( ১ )।

বঙ্গদেশীয় সম্পন্ন গৃহস্থগণের পূজার দালানে বা অনধ্যুষিত আবাস গৃহে অনেক গোলা পায়রা বাস করে। সেই সকল পায়রার বিষ্ঠা সংগ্রহ করিলে প্রতিদিন ৮। ১০ সের পাওয়া যাইতে পারে। ঐ পায়রার বিষ্ঠা, ভাতের ফেন, ক্ষুদ্র মৎস্য এবং খৈল একটা গর্ত্তে বর্ষাকালে পুতিতে হয় এবং চারি পাঁচ মাস পরে তুলিয়া তাহাতে কিছু চূণ ও সোরা মিশাইলে যে "সারমশলা" তৈয়ার হয়, তাহাতে সকল প্রকার কলম বাঁধা যাইতে পারে।

সম্প্রতি পুনা শালের শিল্পবিদ্যালয়ের শিক্ষক ডাক্তার কুক্ আবর্জ্জনা দগ্ধ করিয়া তাহাতে চূণ ও অস্থিচূর্ণ মিশাইয়া একটী উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুতের প্রণালী আবিষ্কার করিয়াছেন। ঐ সার দেখিতে ঝামার ন্যায়। উহা এদেশের কোন্ কোন্ শস্যের উপযোগী, পরীক্ষা করা আবশ্যক।

---

( ১ ) "রৌদ্রে সংশোধ্য তৎসর্ব্বং কৃত্বা গুণ্ডক রূপিণং।
ফাল্গুনে প্রতি কেদারে গর্ত্তং কৃত্বা নিধাপয়েৎ॥
ততোবপন কালে তু কুর্য্যাৎ সার বিমোচনং।
বিনা সারেণ যদ্ধান্যং বর্দ্ধতে ন ফলত্যপি॥"

সার সকল মাঘ মাসে রৌদ্রে শুষ্ক ও চূর্ণ করিয়া ফাল্গুনে প্রতি কেদারের নিকট গর্ত্ত খনন পূর্ব্বক পুতিয়া রাখিবে। পরে বপনের কিছু পূর্ব্বে ভূমিতে ছড়াইয়া দিবে। এইরূপে সার না দিলে ধান বর্দ্ধিত ও ধানে শস্য হয় না।

## সারের তালিকা ও সংক্ষিপ্ত বিবরণ।

১। জল......ইহা সমস্ত শস্য ও উদ্ভিজ্জের প্রয়োজনীয়। সকল প্রকার ভূমিতেই জলের প্রয়োজন। জল, শস্যাদি রোপণ ও বপনের পূর্ব্বেও দিতে হয়, পরেও দিতে হয়। শাক কিম্বা ফল ফুলের চারায় জল দিবার সময় এরূপ সতর্ক হওয়া উচিত; যেন জলের বেগে গোড়া বাহির হইয়া না পড়ে। ইহা উদ্ভিজ্জের মূলে ও সর্ব্বগাত্রে দেওয়া উচিত। ইহার পরিমাণ নির্ণীত হইতে পারে না। কখন অধিক, কখন অল্প প্রয়োজন হয়। তবে কৃষককে সতর্কভাবে দেখিতে হয়, যেন জলাভাবে কিম্বা জলের আধিক্যে বৃক্ষাদি না মরিয়া যায়। ইহার মূল্য প্রায় লাগে না; তবে সময় ও স্থল বিশেষে জলের খাজনা ও জল সেচিবার মজুরি কিয়ৎ পরিমাণে লাগিয়া থাকে।

২। চূণ......যে সকল জমিতে অধিক আগাছা জন্মে এবং সহজে নষ্ট হয় না, সেই সকল জমিতে চূণ দিতে হয়। ইহা বপনাদির অনেক পূর্ব্বে চূর্ণাবস্থায় জমিতে ছড়াইয়া দিতে হয়। বিঘা প্রতি ১০।১৫ সের চূণ লাগে; উহার মূল্য ।৶০ ছয় আনার বেশি নহে। অধিক পূর্ব্বে ভূমিতে চূর্ণ না দিলে উহার ঝাঁজে ভাল শস্যও নষ্ট হইয়া যাইতে পারে।

৩। অস্থিচূর্ণ..... ইহা আটাল মাটীর বিশেষ উপযোগী; বপনাদির অনেক পূর্ব্বে দিতে হয়। সচরাচর ইক্ষু-ক্ষেত্রে এই সার দেওয়া হয়। ইহার পরিমাণ ও মূল্যের নির্ণয় হইতে পারে না। হাড় কুড়াইতে এবং বড় বড় হাড় ভাঙ্গিয়া কুচি করিতে

কিছু খরচ পড়ে। বোধ হয় এক টাকা ব্যয়েই এক বিঘা জমিতে হাড়ের কুচি দেওয়া হইতে পারে।

৪। খৈল .....ইহা গুঁড়া করিয়া আলু, কোপি, পাট, ইক্ষু ইত্যাদির জমিতে বপনাদির পূর্ব্বে ও পরে মধ্যে মধ্যে দিতে হয়। খৈল মাটীর অধিক নীচে না পড়ে। প্রায় সকল প্রকার ভূমিতেই খৈল দিতে পারা যায়। ইহা নানা প্রকার। প্রতি বিঘায় অন্যূন ১/০ মণ লাগে। তাহার গড়মূল্য ১৲ টাকা।

৫। গোবর......ধান্য, রাঙ্গাআলু, শাকআলু, পাট ইত্যাদির ভূমিতে দেওয়া যায়। গোবর পৃথক স্থানে পচাইয়া শুষ্ক করত বপনাদির পূর্ব্বে জমিতে দিতে হয়। ঢাল জমিতে গোবর রাখিলে তাহার যে রস গড়াইয়া আসে, সেই রস চারা গাছের গোড়ায় দিতে হয়। প্রতি বিঘায় ২০/ মণ গোবর লাগে। উহার মূল্য ॥০ আট আনা এবং ইহা অন্য স্থান হইতে আনিয়া ক্ষেত্রে দিতেও আর ।০ চারি আনা খরচ পড়িতে পারে।

৬। অন্যান্য পশুর মল.....অশ্বের মল, বাঁশ, নারিকেল, খেজুর, সুপারি ইত্যাদির মূলের কিঞ্চিৎ নিম্নে দিতে হয়। মেষ, ছাগ, শূকর ইত্যাদির মল যে সে শস্যের ক্ষেত্রে দেওয়া যাইতে পারে। বিঘা প্রতি ঐ সকল মলের ২ মণ হইতে ৪ মণ পর্য্যন্ত দেওয়া যায়। উহা বপনাদির পূর্ব্বে জমি প্রস্তুত করিবার কালে দিতে হয়। উহার খরচ বিঘা প্রতি বোধ হয় ১৲ এক টাকার বেশি পড়ে না।

৭। মূত্র......সকল প্রকার জন্তুরই মূত্র উত্তম সার।

কিন্তু উহা পৃথক্‌ স্থানে অনেক দিন পচাইয়া চতুর্গুণ জলের সঙ্গে মিশাইয়া চারা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া ঢালিয়া দিতে হয়। প্রতি গাছের গোড়ায় ৵৷৹ সের হিসাবে দিলে বিঘায় ১৲ এক টাকা খরচ পড়িতে পারে।

৮। পলিমাটী……আলু, কোপি, তামাক, শাঁকআলু, কচু প্রভৃতি যাবতীয় উৎকৃষ্ট শস্যে এবং বাঁশ, নারিকেল, গুবাকাদি ফসলে দেওয়া যায়। বপনাদির অনেক পূর্ব্বে দিতে হয়। এই সারের মূল্য প্রায়ই দিতে হয় না। ক্ষেত্রের নিকটস্থ বিল খালাদি হইতে তুলিয়া লইতে পারিলেই হয়। ন্যূনাধিক ২৲ দুই টাকা খরচ করিলে যত মাটী উঠিতে পারে, এক বিঘা জমির পক্ষে তাহাই যথেষ্ট।

৯। বোদমাটী……আম্র, কাঁটাল, নারিকেল, লিচু, কলা, কার্পাস ইত্যাদি যাবতীয় বড় বড় বৃক্ষাদির পক্ষে বিশেষ উপযোগী। বৃক্ষাদি রোপণের পূর্ব্বেই এই সার দিয়া জমি তৈয়ার করিতে হয়। বিঘা প্রতি ইহার পরিমাণ পলিমাটীর অপেক্ষা অল্প, কিন্তু খরচ উহারই তুল্য।

১০। ফাসমাটী……ইহা প্রায় সর্ব্বপ্রকার শাক ও শস্যের পক্ষেই উপযোগী। ক্ষেত্রে দেওয়ার নিয়ম ঠিক গোবরের ন্যায়। বিঘা প্রতি ১০ মণ হইলেই যথেষ্ট হয়; কিন্তু উহার খরচ প্রায় তিন টাকা পড়ে।

১১। ছাই……তামাক, ধান, মানকচু ইত্যাদি শস্যে দিতে হয়। তামাক ও ধানের জমিতে অন্যান্য সারের সঙ্গে মিশ্রিত করিয়া পূর্ব্বেই দিতে হয়। মানকচুর গাছ যত বড় হইবে, ততই উহার গোড়ায় ছাই উচু করিয়া দিতে হয়।

হার মূল্য প্রায়ই লাগে না; বাড়ী হইতে ক্ষেত্রে লইয়া যাইতে যে কিছু খরচ পড়ে। তবে ছাইগুলি ইতস্ততঃ নিক্ষেপ না করিয়া যত্ন পূর্ব্বক রাখা আবশ্যক।

১২। লবণ বা সোরা......অন্যান্য সারের সহিত মিশ্রিত করিয়া তামাকের জমিতে বিঘা প্রতি ৫।৬ সের পরিমাণে দিতে হয়। যে যবক্ষারজান পদার্থ উদ্ভিদের জীবন স্বরূপ, উদ্ভিদ্ খাটী সোরা হইতে তাহা সহজেই গ্রহণ করিতে পারে।

---

# দ্বাদশ পাঠ।

## শস্য পর্য্যায়।

কৃষি কার্য্য সম্পাদনে কৃষককে যে সকল বিষয়ে দৃষ্টি রাখিতে হয়, তন্মধ্যে ভূমি, সার, পাইট ও শস্য-পর্য্যায় এই চারিটী প্রধান। প্রথমে তিনটীর কথা অন্যান্য পাঠে বিবৃত হইয়াছে, এই পাঠে কেবল শস্যপর্য্যায় সম্বন্ধে কিছু লিখিত হইবে।

যেমন ভিন্ন ভিন্ন প্রাণীর ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য নির্দ্দিষ্ট আছে, তেমনি ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদের ভিন্ন ভিন্ন খাদ্য নির্দ্দিষ্ট আছে। উদ্-ভিদ্গণ মৃত্তিকা ও বায়ু হইতে মূল, পত্র ও নবীন ত্বক্ দ্বারা সেই সকল খাদ্য আহার করিয়া জীবন ধারণ করে। উদ্ভিদ্গণ মূল ও পত্র দ্বারা কিরূপে আহাব গ্রহণ ও পরিপাক করে এবং সেই সকল খাদ্য উদ্ভিদ্ শরীরে কিরূপে পরিচালিত হইয়া তাহাদের দেহ পোষণ করে, তাহা "সার" ও "পাইট" নামক পাঠদ্বয়ে, বিশেষতঃ "কৃষি-বিজ্ঞান" নামক পাঠে সবিশেষ বিবৃত হইয়াছে।

যেমন রেশমকীট বা পলু পোকার খাদ্য তুতপাতা; তুতপাতা পূর্ণ পাত্রে পলু পোকা ছাড়িয়া দিলে তাহারা কিয়ৎকালের মধ্যে তুতপাতা ভোজন পূর্ব্বক পাত্র শূন্য করিয়া ফেলে, তেমনি যে ক্ষেত্রে ধান্য বপন বা রোপণ করা হয়, সেই ক্ষেত্রে ধান্যের যে খাদ্য আছে, তাহাও দুই তিন বর্ষে নিঃশেষ হইয়া যায়। কোন ভূমিতে যে কোন ফসল প্রথম বর্ষে যেমন হয়, দ্বিতীয় বর্ষে তেমন হয় না, তৃতীয় বর্ষে তদপেক্ষা মন্দ হয়, চতুর্থ বর্ষে হয়ত মোটেই হয় না।

এক ভূমিতে কোন ফসল প্রতিবৎসর সমান হয় না, এতত্বটী আমাদের দেশের কৃষকগণ জ্ঞাত আছেন; এই জন্য তাঁহারা কোন ভূমিতে কোন শস্য দুই তিন বৎসর করিয়া কিছুকাল সেই ভূমির চাস আবাদ বন্ধ রাখেন। কিন্তু অনেক কৃষকের ইহা জানা নাই যে, সেই ভূমিতে দুই তিন বৎসর অন্তর শস্য বদ্লাইয়া দিলে চিরকালই সমান ফসল হইতে পারে, ভূমির চাস আবাদ বন্ধ রাখিবার প্রয়োজন হয় না। বিশেষতঃ ক্রমশঃ লোক সংখ্যার বৃদ্ধির জন্য ভূমির পরিমাণ অল্প হওয়ায় এবং বিদেশে শস্য চালানি জন্য অধিক শস্য উৎপাদনের প্রয়োজন হওয়ায় এখন আর কোন আবাদি জমির আবাদ বন্ধ রাখিবার যো নাই। এখন হয় "শস্য পর্য্যায়" প্রণালী অবলম্বন পূর্ব্বক, না হয়, ভূমিতে সার দিয়া প্রতিবৎসর অবাধে আবাদ চালাইতে হইবে। ঢাকা বরিশাল অঞ্চলের কৃষকগণ কিয়ৎ পরিমাণে ঐ প্রণালী অবগত আছেন।

ভূমিতে সার দিয়া প্রতিবৎসর আবাদ চালান অপেক্ষা "শস্য পর্য্যায়" প্রণালী অবলম্বনে কৃষকের অনেক সুবিধা

আছে। প্রতিবৎসর ভূমিতে সার দিতে ব্যয় আছে; শস্য পর্য্যায়ে আবাদ খরচ এবং প্রথম প্রথম দুই তিন বৎসর নূতন শস্যের বীজ ক্রয় ব্যতিরেকে অন্য আর কোন ব্যয়ই নাই। তবে যে সকল কৃষকের কৃষিক্ষেত্র এমন স্থানে অবস্থিত, যেখানে নদীর বার্ষিক প্লাবনে ক্ষেত্র প্লাবিত হয়, সে সকল কৃষক সার দিবার ব্যয় স্বীকার ও শস্য পরিবর্ত্তন না করিয়াও প্রতিবৎসর একই ফসল সমান পরিমাণে পাইতে পারেন। কেননা নদীর প্লাবনে উদ্ভিদ্ পোষণ বিবিধ সার অনায়াসে ক্ষেত্রে আসিয়া সঞ্চিত হয়। এরূপ সুবিধা অল্প কৃষকের ভাগ্যেই ঘটিয়া থাকে; কেবল আফ্রিকার অন্তর্গত নীল নদের তীরবর্ত্তী কৃষকগণকে বিধাতা ঐ বিষয়ে চিরভাগ্যবান্ করিয়া রাখিয়াছেন। আবার হয়ত, তাহাদের অন্য কোন বিষয়ে এমন অসুবিধা আছে, এদেশীয় কৃষকগণকে তাহা স্বপ্নেও ভোগ করিতে হয় না। ভারতে যে, ঐ প্রকৃতির নদী ও চিরোর্ব্বর কেদার খণ্ড সকল এক কালেই নাই, তাহা নহে।

এই সঙ্গে আর একটী বিষয় জানা কৃষকগণের নিতান্ত আবশ্যক এবং এই পাঠের মধ্যে সেই কথাটী বিশেষ মনোযোগার্হ। কিন্তু দুঃখের বিষয় এই উহা আমরাও ভাল জানি না; তবে যতদূর সংগ্রহ করিতে পারা গিয়াছে, তাহা অবশ্যই বলিয়া দিব। কোন্ উদ্ভিদের দেহ পোষণ বিষয়ে কোন্ উদ্ভিদ্ সহকারী; কোন্ উদ্ভিদের পূর্ব্বে বা পরে কোন্ উদ্ভিদ্ বপন বা রোপণ করিলে অন্যোন্যের সাহায্য হয়, এই তত্ত্বগুলি জানিয়া "শস্য পর্য্যায়" করা বড়ই লাভের বিষয়। উহার একটী স্থূল নিয়ম এই, যদি কোন ক্ষেত্রে গুচ্ছমূল বিশিষ্ট উদ্ভিদ্

দুই তিনবর্ষ জন্মিয়া তাহার ফলন কম হইয়া থাকে, তবে দ্বৈভাগিক মূল বিশিষ্ট উদ্ভিদ্ সেই ক্ষেত্রে বপন বা রোপণ করিলে, তাহা আবার তিন চারি বৎসর ধরিয়া উত্তমরূপে হইতে থাকিবে। কেননা গুচ্ছমূল মাটীর অধিক নিম্নে যাইতে পারে না, যেমন ধান্য, যব, গম, জৈ, মটর, মসূর, কড়াই, মুগ ইত্যাদি। ইহারা খাদ্য সংগ্রহ করিয়া মৃত্তিকার উপরিভাগকে সারশূন্য করিয়া ফেলে। দ্বৈভাগিক মূল মৃত্তিকার অনেক নিম্নে গমন করিতে পারে। যেমন অরহর, কার্পাস, পাট, নীল, তুত, চা ইত্যাদি। এইরূপ ফসল তিন চারি বৎসর হইলে পুনরায় পূর্ব্ব ফসল সেই ভূমিতে হইতে পারে।

যেমন ভিন্ন ভিন্ন ব্যক্তি স্ব স্ব রুচি অনুসারে আহার করিয়া থাকেন, উদ্ভিদ্গণেরও সেইরূপ আহাব বিষয়ে বিভিন্ন রুচি। ভিন্ন ভিন্ন উদ্ভিদ্ ভিন্ন ভিন্ন আহার গ্রহণ করে। ধান্য, গম, যব জৈ প্রভৃতি জাতীর উদ্ভিদ্ যাহা আহার করে; মটর, ছোলা, অরহর, মুগ প্রভৃতি জাতীয় উদ্ভিদ্ তাহা আহার করে না। যবক্ষারজান সকল জাতীয় উদ্ভিদ্ই অল্পবিস্তর পরিমাণে আহার করিয়া থাকে। অতএব দুই তিন বর্ষ অন্তর এইরূপ বাছিয়া বাছিয়া চাস আবাদ করিতে পারিলে বিনাসারে বা অল্প সারে, এক ক্ষেত্রে চিরকালই আবাদ চলিতে পারে। বর্ত্তমান কালে এইরূপ প্রণালীতে চাস আবাদ করা, নিতান্ত আবশ্যক হইয়া উঠিয়াছে।

# ত্রয়োদশ পাঠ।

## পাইট।

উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বৃদ্ধি বিষয়ে মৃত্তিকা, জল, বায়ু, উত্তাপ ও আলোক এই গুলি বিশেষ প্রয়োজনীয়। যে সকল পদার্থের (১) সাহায্যে উদ্ভিদ্ জন্মিতে ও বাঁচিয়া থাকিতে পারে; জল, বায়ু ও মৃত্তিকায় সেই সকল পদার্থ আছে বটে; কিন্তু তাহারা সর্ব্বদা উদ্ভিদের পোষণোপযোগী অবস্থায় থাকে না। যে প্রক্রিয়া দ্বারা সেই সকল পদার্থ উদ্ভিদের পোষণোপযোগী অবস্থা প্রাপ্ত হয় এবং উদ্ভিদ্‌গণ উত্তম রূপে বর্দ্ধিত হইতে পারে, তাহার নাম পাইট।

এদেশে বৈশাখ হইতে ভাদ্র মাসের মধ্যে যত বৃষ্টি পতিত হইয়া ভূমিকে রসাইয়া ফেলে, কার্ত্তিক মাস পর্য্যন্ত ভূমিতে সেই রস থাকে। এই জন্য কোন নূতন ভূমিতে শস্যাদি জন্মাইতে হইলে হেমন্ত ঋতুর মধ্যে সেই ভূমি কোদাল দ্বারা কাটিতে হয়। এই সময়ে বর্ষার প্রাদুর্ভাব না থাকায়, ভূমির উপরিস্থ ঘাস ও আগাছা সকল মাটীর নীচে পচিয়া ভূমির তেজ বৃদ্ধি করে এবং সমস্ত শীত কালের শিশির সেই মাটীর সহিত মিশিয়া মাটীকে কিয়ৎ পরিমাণে শিথিল ও উর্ব্বরা করিয়া দেয়। তাহার পর যখন জল হইবে, তখনই "যো" দেখিয়া জমিতে চাস দিবে। কৃষি-পরাশরে ভূমিকর্ষণ বিষয়ে এইরূপ ব্যবস্থা আছে। যথা—

---

(১) অম্লজান, অঙ্গার অম্ল, যবক্ষারজান য্যামোনিয়া, উদজান, পটাস, ফস্‌ফরিক অম্ল, চূণ, ইত্যাদি।

"হৈমন্তে কৃষাতে হেম বসন্তে তাম্ররৌপ্যকং।
ধান্যং নিদাঘকালে তু দারিদ্র্যন্তু ঘনাগমে।"

হেমন্ত কালে ভূমি কর্ষণ করিলে সোণা ফলে, বসন্তে তাম্র ও রৌপ্য, এবং গ্রীষ্মে ধান্য ফলে; কিন্তু বর্ষায় কর্ষণ করিলে কেবল দারিদ্র্য উপস্থিত হয়। ইহা দ্বারা হেমন্ত ও বসন্ত ঋতুতে ভূমি কর্ষণই প্রশস্ত দেখা যাইতেছে। যখন মৃত্তিকার এরূপ অবস্থা হয় যে, তাহাতে রস আছে, অথচ খননকালে লাঙ্গল কিম্বা কোদালে মাটী জড়াইয়া লাগে না, মাটীর তাদৃশী অবস্থাকে "যো" কহে।

জল উদ্ভিদের পক্ষে এত উপকারী, তথাপি মূলে জল বসিলে গাছের অনিষ্ট হয়। এই জন্য যাহাতে তরুমূলে জল বসিতে না পায়, তৎপক্ষে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। গ্রীষ্ম-কালে যখন তরুমূলে জলসেকের প্রয়োজন হয়, তখন বিবে-চনা পূর্ব্বক জল দেওয়া উচিত। পূর্ব্বাহ্ণ কিম্বা অপরাহ্ণ ভিন্ন অন্য সময়ে জল দিলে গাছের অনিষ্ট হইয়া থাকে। শুষ্ক মৃত্তিকায় জল শোষিত হইয়া মাটী যে সরস হয়, উদ্ভিদ্, মূল দ্বারা সেই রস পান করিয়া বর্দ্ধিত হয়। বৃক্ষের কাণ্ড, শাখা, প্রশাখা বা পত্রে জল দিলেও কিয়ৎ পরিমাণে উপ-কার হইয়া থাকে। তন্মধ্যে পত্রে জল দেওয়ায় বিশেষ উপকার হয়, কারণ পত্রই উদ্ভিদের প্রধান ইন্দ্রিয়। জল দ্বারা উহার উপরিস্থিত ধুলি ধৌত হইয়া উহার গাত্রস্থ ছিদ্র সকল পরিষ্কৃত ও উহা দ্বারা বায়ুস্থ পোষক পদার্থ (১) শোষিত হইয়া থাকে।

(১) অঙ্গারম্ল, য়্যামোনিয়া, উদজান, যবক্ষারজান, ইত্যাদি।

জল উদ্ভিদ পোষণ দ্রব্য সকলকে তরল করিয়া উদ্ভিদের গ্রহণোপযোগী করিয়া দেয়। জল গাছের নিতান্ত গোড়ায় না দিয়া একটু দূরে দিতে হয়, কারণ গাছের সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল সকল একটু দূরে থাকে এবং সেই সকল মূলই মৃত্তিকার রস শোষণে অধিক সক্ষম। তদ্ব্যতীত অধিক মৃত্তিকা ধৌত হইয়া যে জল আসে, তাহা উদ্ভিদের অধিক পুষ্টিকর। সূক্ষ্ম সূক্ষ্ম মূল সকল দূরে থাকে বলিয়া গাছ, এক স্থান হইতে স্থানান্তর করিবার কালে, পাছে ঐ সকল সূক্ষ্ম মূল নষ্ট হয়, এজন্য গোড়ায় বেশি মাটী রাখা উচিত। যখন কোন গাছ, স্থানান্তর করিবার জন্য তুলিতে হয়, তখন চারিদিক্ যেমন খুঁড়িবে, শুক্না কলার খোলা কিম্বা চট্ দ্বারা অমনি মাটী শুদ্ধ গোড়া বাঁধিতে থাকিবে। এই রূপে মাটীর ভিতর হইতে গোড়া বাঁধিয়া তুলিলে সে গাছ কখনই মরিবে না। বর্ষা, শরৎ ও বসন্ত এই তিন ঋতুতেই উদ্ভিদ স্থানান্তর করা যাইতে পারে। শরতে স্থানান্তরিত বৃক্ষাদি বাড়ে না, যেমন তেমনই থাকে। অনেকে মনে করেন, যত বেশি গর্ত্ত করিয়া চারা পোতা যায়, ততই ভাল; কিন্তু সেটী ভুল। মূলের সীমা অতিক্রম করিয়া গাছ পুতিলে অধিকাংশ উদ্ভিদের অনিষ্ট হয়।

জমিতে চাস দিলেই মাটী আল্‌গা হইয়া শুকাইতে থাকে। ঐ শিথিল ও সছিদ্র মৃত্তিকার মধ্যে বায়ু প্রবিষ্ট হয়। মাটী যত শুষ্ক হইতে থাকে, বায়ুমধ্যস্থ উদ্ভিদের পোষণোপ-যোগী বিবিধ পদার্থের (১) সহিত বায়ুর রস শুষ্ক মৃত্তিকা

(১) অম্লজান, উদজান, য়্যামোনিয়া, যবক্ষারজান প্রভৃতি।

দ্বারা ততই আকৃষ্ট হইতে থাকে। শুষ্ক মৃত্তিকা দ্বারা জল ও বায়ুস্থ পদার্থ সকল আকৃষ্ট হওয়াই, মৃত্তিকার স্বাভাবিক উৎপাদিকা শক্তি প্রাপ্তি বিষয়ক অদ্বিতীয় কারণ। এই জন্য, ভূমি যাহাতে উত্তম রূপে শুকাইতে পারে, কৃষকের তৎপক্ষে সর্ব্বদাই দৃষ্টি রাখা উচিত। এই কারণেই উদ্ভিদ মূলের মৃত্তিকা মধ্যে মধ্যে পরিষ্কার করিয়া খুঁড়িয়া দিতে হয়। নিড়ান, কাড়ান, বিদা দেওয়া প্রভৃতি ক্রিয়া দ্বারা ঐ উদ্দেশ্যই সিদ্ধ হয়। উপরিস্থ বায়ুর রস আকর্ষণ বিষয়ে মৃত্তিকার শুষ্কতা যেমন উপযোগী, ভূমির নিম্নস্থ রসাকর্ষণ বিষয়ে মৃত্তিকার চূর্ণতা ও সছিদ্রতা তেমনি উপযোগী। উদ্ভিদের মূলস্থ মৃত্তিকা চিনির ন্যায় চূর্ণ করিয়া দিলে দীর্ঘকালব্যাপী অনাবৃষ্টিতেও উদ্ভিদের হানি হয় না। কেননা মৃত্তিকার সূক্ষ্ম ছিদ্র দিয়া কৈশিক আকর্ষণ প্রভাবে ভূমির নিম্নস্থ রস উপরে উঠিয়া সূক্ষ্ম মূলের অগ্রভাগস্থ মৃত্তিকা আর্দ্র করিয়া দেয়। "কৃষিবিজ্ঞান" পরিচ্ছেদ মনোযোগ পূর্ব্বক পাঠ করিলে এই সকল বিষয় উত্তমরূপে বুঝিতে পারা যাইবে। বৃক্ষ সকল মূল দ্বারা মৃত্তিকা হইতে যেমন নানাবিধ পদার্থ শোষণ করিয়া আপনার পুষ্টি সাধন করে, পত্র ও ত্বক্ দ্বারাও বায়ু হইতে কোন কোন পুষ্টিকর পদার্থ গ্রহণ করে (১)। ইহা ব্যতীত প্রাণিসদৃশ, উদ্ভিদেরাও পত্র ও ত্বকস্থিত ছিদ্র দ্বারা বায়ু গ্রহণ ও ত্যাগ করিয়া থাকে। অতএব যাহাতে গাছের গোড়ায় এবং সর্ব্বাঙ্গে উত্তম

---

(১) উদ্ভিদ্‌গণ পত্রাদি দ্বারা বায়ু হইতে অঙ্গারাম্ল বায়ু গ্রহণ করিয়া তন্মধ্যস্থ অম্লজান ত্যাগ পূর্ব্বক অঙ্গার মাত্র গ্রহণ করে। অঙ্গার উদ্ভিদের একটী প্রধান উপাদান।

রূপে বাতাস লাগিতে পারে, তাহার ব্যবস্থা করিয়া দেওয়া উচিত।

উদ্ভিদের উৎপত্তি ও বর্দ্ধন বিষয়ে উত্তাপের বিশেষ প্রয়োজন আছে। তাপ বায়ু কর্তৃক শিথিল মৃত্তিকার মধ্যে সঞ্চালিত হইয়া উদ্ভিদের উপকার করে। কতকগুলি উদ্ভিদের অঙ্কুর বা কুসুমোদ্গম হইতে বীজের পরিপক্কাবস্থা পর্য্যন্ত অতি অল্প পরিমিত তাপের প্রয়োজন হয়, কতকগুলি উদ্ভিদের জীবন ও বর্দ্ধন বিষয়ে অত্যধিক তাপ আবশ্যক এবং আর কতকগুলির পক্ষে এই দুই সীমার মধ্যবর্ত্তী তাপের প্রযোজন হয়। উষ্ণ মৃত্তিকাই উদ্ভিদের বৃদ্ধি বিষয়ে বিশেষ উপকারী। কৃষ্ণ বর্ণ মৃত্তিকা সচরাচর অধিক তাপ আশোষণ করে, এই জন্য উক্ত-বিধ মৃত্তিকায় উদ্ভিদ উত্তমরূপে বৃদ্ধি পায়। বীজের উপরিভাগ পচিয়া ও ফাটিয়া যে অঙ্কুর নির্গত হয়, তাহা তাপেরই কার্য্য। তাপ ভিন্ন বৃক্ষমূল, মাটী হইতে উত্তমরূপে রস শোষণ করিতে পারে না। কারণ উত্তাপ লাগিলে বৃক্ষের পত্র ও ত্বক্ দ্বারা অভ্যন্তরস্থ রস বাষ্পাকারে নির্গত হয়। তাহাতেই উদ্ভিদের আভ্যন্তরিক রসের পরিপাক হয়। গ্রীষ্মকালের মধ্যাহ্নে কোন কোন উদ্ভিদের পত্রাবলী সঙ্কুচিত হইয়া পড়ে; পত্রস্থ ছিদ্র দ্বারা অধিক পরিমাণে বাষ্প নির্গম, তাহার কারণ। পত্রাদি দ্বারা যত অধিক পরিমাণে বাষ্প নির্গত হয়, মূল দ্বারা ততই মৃত্তিকারস আকৃষ্ট হইয়া উদ্ভিদের পোষণ করে। অতএব যাহাতে উদ্ভিদের সর্ব্বাঙ্গে উত্তমরূপে তাপ লাগিতে পারে, তদ্বিষয়ে কৃষকের বিশেষ দৃষ্টি রাখা উচিত। "আওতায়" যে গাছ পালা ভাল হয় না, ইহাও তাহার একটী কারণ। আমা-

দের সংস্কার আছে হলুদ, আদা, আনারস প্রভৃতি "আওতা" ভিন্ন হয় না। পরীক্ষা দ্বারা জানা গিয়াছে, ঐ সকল গাছ আওতায় হইতে পারে, কিন্তু অনাবৃত স্থানে তদপেক্ষা ভাল হয়। যদি এমন বুঝায় যে, উত্তাপের অল্পতায় কোন উদ্ভিদের অবস্থা মন্দ হইয়া আসিতেছে, তাহা হইলে এরূপে উহার গোড়া খুঁড়িয়া দেওয়া উচিত যেন, মূলে রৌদ্র লাগিতে পারে। আর ঐ উদ্ভিদের কতকগুলি পত্র নষ্ট করিয়া দিবে। এক মাস এইরূপে রাখিয়া মূল সারপূর্ণ করিয়া জল সেচন করিবে। আর যদি তাপের আধিক্যে অনিষ্ট হইতে থাকে, তাহা হইলে গোড়ায় অধিক পরিমাণে মাটী ও খড় দিয়া জল সেচন করিবে।

আলোক (১) ভিন্ন উদ্ভিদ্ রসের পরিপাক, উহাতে কাষ্ঠ সংস্থান এবং উহার মধ্যে রসসঞ্চারাদি কার্য্য সুচারুরূপে নির্ব্বাহিত হয় না। অন্ধকারে কেবল সুন্দররূপে অঙ্কুর নির্গত হইতে পারে। অনেকে দেখিয়াছেন, যে সকল তরু কিম্বা লতা আলোক পায় না, তাহারা শাদা ও অশক্ত হইয়া থাকে। অতএব যাহাতে উদ্ভিদ্গণ বিশিষ্টরূপে আলোক পায়, তাহার উপায় করা উচিত। যে সকল বৃক্ষ আলোকে উৎপন্ন হয় না, তাহা জ্বালানির পক্ষে বিশেষ উপযোগী নহে। আলোকের সহিত উদ্ভিদের সম্বন্ধ বিচিত্র। সকল উদ্ভিদই যে ঊর্দ্ধ গমন করিবার চেষ্টা করে, আলোকাকর সূর্য্যই তাহার কারণ।

---

(১) আলোকে অম্ল-অঙ্গারক বাষ্প হইতে অঙ্গার ও অম্লজান পৃথক্ হইয়া থাকে। আলোক ভিন্ন উদ্ভিদ হরিতবর্ণ প্রাপ্ত হয় না। অম্ল-অঙ্গারক বাষ্পের উক্ত বিধ বিভাগ রাত্রে হয় না।

যদি তরু কিম্বা লতায় অধিক পরিমাণে শাখা ও পত্র থাকে, তাহা হইলে গাছের ফলোৎপাদিকা শক্তি অল্পিতে বিনষ্ট হয়। এই জন্য কতকগুলি অনাবশ্যক শাখাদি কাটিয়া দেওয়া উচিত। কয়েকটী মাত্র পত্র রাখিয়া অবশিষ্ট শাখা পত্র ও ফুল ভাঙ্গিয়া না দিলে তামাক ত হইতেই পারে না। এইরূপ কার্য্য দ্বারা উদ্ভিদ শীঘ্র সতেজে বাড়িয়া উঠে।

শস্যক্ষেত্রের চারা সকল অতিশয় ঘন হইলে উপযুক্ত রূপ বায়ু আলোকাদির অভাবে ক্ষেত্রের অনিষ্ট হইতে পারে। এই জন্য কতকগুলি গাছ মারিয়া ফেলা উচিত। কৃষকেরা বিদা, বাঁশি প্রভৃতি দ্বারা ধান্য-ক্ষেত্রে ঐ কার্য্য করিয়া থাকে।

কোন তরু কিম্বা লতাদি, শাখা পল্লবে অধিক সতেজ হইয়াছে অথচ ফুল ও ফল হইতেছে না, এমন অবস্থায় কোন শাখার এক স্থান অল্প পরিমাণে ছেঁচিয়া কিম্বা মচকাইয়া দিলে, ঐ শাখায় অচিরকাল মধ্যে ফুল ও ফল হইয়া থাকে। যে গাছে বেশি ফল হয়, তাহার কতকগুলি ফল ভাঙ্গিয়া দিলে, অবশিষ্টগুলি অপেক্ষাকৃত বড় ও সুস্বাদ হয়।

এরূপ শুনা গিয়াছে এবং কোন কোন পুস্তকেও পাঠ করা গিয়াছে যে, মুকুলোদ্গম কালের অগ্রে বৃক্ষের কাণ্ডপরিধিস্থ ত্বক্ ২।৪ অঙ্গুলি পরিমাণে তুলিয়া ফেলিলে ফলের সংখ্যা ও পুষ্টতা অধিক হইয়া থাকে।

উদ্যান বা শস্যক্ষেত্রে যাহাতে পাতাল-ফোঁড়, বেঙের ছাতা প্রভৃতি উদ্ভিদ্ না জন্মে তদ্বিষয়ে কৃষকের দৃষ্টি রাখা উচিত। কারণ ভূমিতে উদ্ভিদের পোষণকারী যত প্রকার সামগ্রী থাকে, উক্ত জাতীয় উদ্ভিদ তাহার সমুদায়ই আত্মসাৎ

করিয়া ফেলে, এই জন্য ক্ষেত্রস্থ অন্যান্য প্রয়োজনীয় বৃক্ষাদি নিস্তেজ হইয়া পড়ে।

---

## চতুর্দ্দশ পাঠ।

### প্রধান প্রধান শস্যের আবাদ কিরূপ?

ধান্য, গম, কার্পাস, নীল, তুঁত, ইক্ষু, খর্জ্জুর, পাট, আলু, হরিদ্রা, আদা, পলাণ্ডু, তামাক ইত্যাদি এদেশের প্রধান লাভজনক শস্য। ভারতবর্ষে যত প্রকার শস্য আছে, সমস্তের আবাদ প্রণালী ও লাভের হিসাব এ গ্রন্থে দেওয়া সম্ভব নহে। তবে যে সকল শস্যের আবাদ ও লাভের হিসাব এ দেশে সাধারণতঃ জানা নাই, এ গ্রন্থে সংক্ষেপে তাহাদিগেরই বিবরণ প্রদত্ত হইবে। এই পাঠের মধ্যেই খর্জ্জুরের বিষয় লিখিত হইল।

সকলেই জানেন খেজুর গাছের চাস আবাদে লাভ আছে। লোকের বাড়ী, বাগান ও পুষ্করিণীর ধারে আপনিই খেজুর গাছ হইয়া থাকে। কোন কোন স্থলে বা দুই চারিটী খেজুরের বাগানও দেখা যায়। শীত কালে শিউলিরা সেই সকল গাছ কাটে বা কামায় এবং গুড় নাগরি করিয়া বিক্রয় করে; আমরা ইহাই দেখিতে পাই। কিন্তু কিরূপে খেজুর গাছের আবাদ করিতে হয় এবং কত ব্যয়ে গুড় প্রস্তুত হইয়া কি লাভ থাকে, আমরা তাহার কোন হিসাবই রাখি না। যশোহর প্রদেশে কৃষকেরা যেরূপে খেজুর গাছের আবাদ ও গুড় বেচিয়া লাভ করে, তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগ্রহ করা গেল (১)।

---

(১) বিখ্যাত ডেপুটি মাজিষ্ট্রেট বাবু রামশঙ্কর সেনের সংগৃহীত যশোহরের ষ্ট্যাটিষ্টিক্যাল রিপোর্টে ইহার সবিশেষ বিবরণ লিখিত আছে।

প্রাচীন খেজুর গাছের তলায় যে পাকা খেজুর আপনি পড়ে, কৃষকেরা তাহা কুড়াইয়া আনিয়া বাড়ীতে হাপর দেয়। চারা সকল বাহির হইলে সর্ব্বদা হাপরের জমি পরিষ্কৃত রাখিতে হয়। তিন বৎসরের পর ঐ সকল চারা সমভূমিতে লইয়া দশ বার হাত অন্তরে শ্রেণীবদ্ধরূপে রোপণ করে। ভূমি পরিষ্কার রাখিবার জন্য মধ্যে মধ্যে চাস দিতে হয়। সাত বৎসরের মধ্যেই গাছ সকল কাটিবার যোগ্য হয়। এক বিঘা জমিতে ন্যূনসংখ্যায় এক শত বৃক্ষ হইতে পারে। যে ভূমি উর্ব্বরা অথচ বর্ষাকালে জলপ্লাবিত হয় না, তাহাই খেজুর গাছের পক্ষে উপযোগী। জলা বা লোণা জমিতে ঐ বৃক্ষ উত্তমরূপে হইতে পারে না।

আশ্বিন মাসই গাছ কামানর প্রশস্ত সময়। কার্ত্তিকের শেষে বা অগ্রহায়ণের প্রথম হইতেও গাছ কাটা ও রস সংগ্রহ আরব্ধ হইয়া থাকে। শীতের ন্যূনাধিক্য বশতঃ সময়ের অগ্র পশ্চাৎ হইয়া থাকে। গাছের পূর্ব্ব ও পশ্চিম দিকে কাটিতে হয়; কারণ তাহাতে ক্ষত স্থান উত্তম রূপে শুকাইতে পায়। তবে গাছ ঝটিকাদি কারণে দিক বিশেষে হেলিয়া পড়িলে কখন কখন ঐ দুই দিকে কাটার ব্যাঘাত হইতে পারে। কিরূপে গাছ কাটে এবং কিরূপে রস জাল দিয়া গুড় প্রস্তুত করে, তাহা এ দেশের অনেকেই অবগত আছেন। একটী গাছে নিম্নলিখিত রূপ রস পাওয়া যাইতে পারে। গাছ প্রতি-দিন কাটিতে নাই; মধ্যে মধ্যে জিরান দিতে হয়। এ ছাড়া অত্যন্ত শীত, কোয়াসা, ঝটিকা ইত্যাদি কারণেও কতক দিন

গাছ কাটা কামাই যায় (১)। এই কারণে অগ্রহায়ণ হইতে ফাল্গুন পর্য্যন্ত এই চারি মাসে পঞ্চাশ দিনের অধিক গাছ কাটা হয় না। ঐ পঞ্চাশ দিনে ৬ মণ রস পাওয়া যায়। দশ সের রসে এক সের গুড় হয়, এই হিসাবে ঐ রসে চব্বিশ সের গুড় হইতে পারে। উহার মূল্য ১৲ এক টাকা। রস একত্র করা এবং গুড় তৈয়ার করায় প্রতি গাছে।৵১০ ব্যয় পড়ে। এ হিসাবে প্রতিগাছে ॥/১০ লাভ থাকে। সুতরাং এক বিঘা জমির খেজুর গাছে সর্ব্বপ্রকার ব্যয় বাদে ৫০৲ টাকা লাভ অনায়াসেই থাকিতে পারে।

যে কার্য্যে আশু ফল দেখা যায় না, সে কার্য্যে অগ্রসর হইতে এ দেশের অনেকেরই প্রবৃত্তি হয় না। কারণ অদ্য বৃক্ষাদি রোপণ করিয়া আট দশ বর্ষান্তে তাহার লাভ ভোগ করিব, আমাদের এরূপ সহিষ্ণুতা হয় না। কিন্তু কৃষি-বাণিজ্যাদিতে সহিষ্ণুতাই বিশেষ প্রয়োজনীয়। তদ্ভিন্ন ঐ সকল বিষয়ে ফল পাওয়া যায় না।

---

## পঞ্চদশ পাঠ।

### আলু।

আলু নানাবিধ; তন্মধ্যে এস্থলে গোল আলু বা বিলাতী আলুর বিষয় লিখিত হইবে। যেহেতু ঐ আলুই একটী

(১) ১২৭৯ সালের মাঘ মাসে ঝিনাদহের মধ্যে কোন ভদ্র লোকের গুড়ের কারখানায় কয়েক দিন গুড়ে ভাল দানা বাধে নাই। অনুসন্ধানে স্থির হইয়াছে, শীত এবং গাছ কামান অধিক হইলে "রস হাল্কা" হয়, তাহাতে গুড় ভাল হয় না।

প্রধান খাদ্যের মধ্যে গণ্য এবং লাভজনক শস্য। উহা সর্ব্ব-প্রথমে দক্ষিণ আমেরিকার অরণ্যে স্বভাবতই উৎপন্ন হইত; অনধিক দুই শত বৎসরের মধ্যে উহা পৃথিবীর সর্ব্বত্র ব্যাপ্ত হইয়া একটী প্রধান শস্যের মধ্যে গণ্য হইয়াছে।

বঙ্গদেশের মধ্যে অতি অল্প স্থানেই এই আলুর আবাদ হইয়া থাকে। আবার গঙ্গার পূর্ব্ব পারে নদীয়া ও ২৪ পরগণার দুই চারি খানি গ্রাম ভিন্ন আর কুত্রাপি উহার আবাদ হয় না। এমন লাভজনক ও প্রয়োজনীয় শস্যের আবাদ এ দেশের সর্ব্বত্র প্রচলিত না হইবার একটী কারণ এই, অত্রত্য কৃষকগণের এইরূপ সংস্কার আছে যে, গোল আলুর আবাদ সকল স্থানে হইতে পারে না; উহা যে যে স্থানে হইয়া থাকে, সেই সেই স্থানেই হইতে পারে। সকল দেশের কৃষকে উহার আবাদ না জানাতেই ঐরূপ ভ্রমাত্মক সংস্কার উৎপন্ন হইয়াছে।

আলুর ভূমি "বার মেসে" হইলেই ভাল হয়। যে ভূমিতে আর কোন শস্যের আবাদ না করিয়া মধ্যে মধ্যে এক একটী চাষ দিয়া কোন নির্দ্দিষ্ট শস্যের জন্য রাখিয়া দেওয়া যায়, তাহাকেই "বার মেসে" ভূমি কহে। কোন কোন কৃষক আলুর জমিতে যথাকালে কাঁকুড়, ভুঁয়ে শশা, প্রভৃতি শস্য উৎপন্ন করিয়া লয়। পলিমাটী, রেড়ির খৈল, এবং নীলের পাতা-পচা এই তিনটী আলুর পক্ষে উৎকৃষ্ট সার। তন্মধ্যে পলি-মাটী সর্ব্বোৎকৃষ্ট। যদি ভূমিতে রীতিমত ঐ মাটী তোলা যায়, তাহা হইলে আর কোন সার না দিলেও চলিতে পারে। ভূমির মৃত্তিকা আটাল হইলে খৈল দিবার বিশেষ প্রয়োজন

হয়। আলুর মাটী এমন রূপে তৈয়ার করা উচিত যেন, কাশীর চিনির ন্যায় শল থাকে। পলিমাটী ও জল পাওয়ার সুবিধার জন্য আলুর জমি নদী, খাল, বিল, বা পুষ্করিণীর ধারে হওয়া আবশ্যক। রাঢ় দেশীয় কৃষকেরা আলুর জমিতে বৈশাখ মাসে নীল বপন করে। ঐ নীলের পাতা পচাতে ভূমি বিশেষ উর্ব্বরা হয়। অধিকন্তু আষাঢ় শ্রাবণে ঐ নীলের গাছ বিক্রয় করিয়া কিছু লাভ করে।

পূর্ব্বোক্ত রূপে প্রস্তুত জমিতে কার্ত্তিক মাসের প্রথমেই আধ হাত অন্তরে শ্রেণীবদ্ধ করিয়া আলুর বীজ রোপণ করিতে হয়। রোপিত আলুর উপর জলের ছিটা দিবে। যত দিন চারা বাহির না হয়, তত দিন মধ্যে মধ্যে ঐরূপে ছিটা দিতে পারিলে ভাল হয়। প্রত্যেক শ্রেণীর মধ্যে তিন পোয়া ফাঁক থাকা আবশ্যক। চারাগুলি ৬।৭ অঙ্গুলি পরিমিত হইলেই একবার সমস্ত ক্ষেত্রে জল সেচিয়া দিবে। প্রত্যেক বীজ হইতে এক এক গোছা চারা বাহির হয়; ঐ সকল চারার মধ্যে যে গুলি নিস্তেজ, তাহা মারিয়া ফেলিবে। তাহাতে অবশিষ্টগুলির তেজ আরও বৃদ্ধি পাইবে। পরে যো হইলে মাটী উত্তম রূপে ধূলাইয়া গাছের গোড়ায় দাঁড়া বাঁধিয়া দিবে। আট দিন অন্তর ক্ষেত্রে জল সেচিবে এবং যো হইলেই গাছের গোড়ায় মাটী ধরাইবে। ক্ষেত্রে জল সেচিলেই দাঁড়ার মাটী ঝরিয়া ঐ জলে পড়ে; জল শুকাইয়া গেলে আবার সেই মাটী উঠাইয়া দিতে হয়। ক্ষেত্রের এক পার্শ্বে এক একটী প্রশস্ত জলনালী কাটিবে এবং শ্রেণীর পার্শ্ব দিয়া শাখানালী সকলকে ক্ষেত্রের অপর প্রান্ত পর্য্যন্ত লইয়া যাইবে। এই

সমস্ত জলনালী সমতল হওয়া আবশ্যক, নচেৎ সর্ব্বত্র জল সঞ্চালিত হওয়া কঠিন হয়।

পৌষ মাসের প্রথম সপ্তাহে একটী বিদাকাটি কিম্বা সেই রূপ অন্য কোন কাটি দ্বারা গাছের গোড়া খুঁড়িয়া সমস্ত আলু তুলিয়া ফেলিবে, কেবল মটরের মত ক্ষুদ্র ক্ষুদ্রগুলি রাখিয়া চারার গোছাকে ঈষৎ হেলাইয়া পুনর্ব্বার গোড়ায় মাটি ধরাইয়া দিবে। আলু তুলিতে কোন রূপ অস্ত্র ব্যবহার করিবে না। কিন্তু হুগলী বৰ্দ্ধমান প্রভৃতি পশ্চিম দেশীয় কৃষকগণ কোদাইল দ্বারাই আলু তুলিয়া থাকে। আলু তোলার তিন চারি দিন পরে আবার জল সেচিয়া দিবে। গোড়ার আলুগুলি একবার তুলিয়া লইলে গাছ বিলক্ষণ সতেজ হয়। তখন পূর্ব্বোক্ত ছোট আলুগুলি বড় হইতে এবং যে সকল পত্র কক্ষ মাটি চাপা পড়ে, তাহাতেও আলু জন্মাইতে আরম্ভ করে। পরে মাঘ মাসে এক কালে সমস্ত আলু তুলিয়া ফেলিবে। ঐ আলু-গুলি দুই ভাগে বাছাই করিয়া বড়গুলি খাইবার জন্য বেচিয়া ফেলিবে এবং ছোটগুলি বীজের জন্য রাখিয়া দিবে। বীজ উত্তম, পরিষ্কৃত ও বায়ু সেবিত ঘরে মাচার উপর ছড়াইয়া কিম্বা ঝুড়ি করিয়া টাঙ্গাইয়া রাখা আবশ্যক। এত যত্নে রাখিলেও, যাহা রাখা যায়, প্রায় তাহার অর্দ্ধেক পচিয়া যায়। পত্রকক্ষে যে সকল অপেক্ষাকৃত ছোট আলু জন্মে, তাহাই উত্তম বীজ হয়, কারণ ঐরূপ আলুতে অনেক চক্ষু থাকে, সুতরাং তাহা হইতে অনেক চারা বাহির হয়।

এক বিঘা আলু করিতে হইলে, চাসে ৫৲, পলিমাটী তোলায় ২৲, আলু পোতা ১৲, বীজ ১২৲, জল সেচা ৮৲, এবং জমির

খাজানা ৩৲ টাকা; মোট ৩১ টাকা ব্যয়। বীজ ছোট হইলে পাঁচ ছয় মণ লাগে। বড় আলু পোতায় কৃষকের ক্ষতি হয়; কিন্তু স্কট্‌লণ্ড্ দেশীয় কৃষকেরা বড় আলুকে তিন কিম্বা চারি খণ্ড করিয়া রোপণ করে, তাহাতে ক্ষতি হয় না।

প্রতি বিঘায় প্রথম ভাঙ্গায় ২০ হইতে ২৫ মণ আলু পাওয়া যায়। দ্বিতীয় বারেও প্রায় ঐরূপ আলু পাওয়া যায়। পৌষ মাসের প্রথমে যে আলু হয়, তাহার মূল্য ৩৲ হিসাবে অন্যূন ৬০৲ টাকা। দ্বিতীয় বারেও আলু ১৲ হিসাবে ২০৲ টাকা। কিন্তু দ্বিতীয় বারের আলু কৃষকেরা বীজ রাখে এবং উহার মধ্যে পচা বীজ বাদ দিয়াও দশ মণ থাকে। ঐ দশ মণ ন্যূনসংখ্যায় ৬০৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হয়। তাহাতে মোট ১২০৲ টাকা হইতে পারে। উহা হইতে ৩০৲ টাকা হিসাবে খরচ বাদ দিলে প্রতি বিঘায় ৯০৲ টাকা লাভ থাকে। যদি বীজ হিসাবে নাই বিক্রয় করা যায়, তাহা হইলেও লাভ ৫০৲ পঞ্চাশ টাকার কম হয় না।

রাঢ় দেশীয় কৃষকেরা আলু পৌষ মাসের শেষে কিম্বা মাঘের প্রথমে একবারেই ভাঙ্গিয়া ফেলে, তাহাতে তাহাদের আলু কিছু বড় হয়। ঐ দেশের ফলন, ৪০ মণ হইতে ৮০ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে (১)।

---

(১) আলু, কপি, তামাক প্রভৃতির মধ্যে যে সকল রূঢ় বা যৌগিক পদার্থ আছে, উহাদিগের সারেও প্রায় সেই সকল পদার্থ আছে।

# ষোড়শ পাঠ।

## হরিদ্রা।

নূতন জমিতে হলুদ করিতে হইলে কার্ত্তিক কিম্বা অগ্রহায়ণ মাসে একবার উত্তম রূপে জমি কোদলাইয়া রাখিতে হয়; পরে চৈত্রের শেষে কিম্বা বৈশাখের প্রথমে যেমন জল হইবে, তেমনিই "যো" দেখিয়া লাঙ্গল ও মই দিয়া জমি সমান করিতে হয়। হলুদের জমিটী সমান হইবে, অথচ পার্শ্ববর্ত্তী ভূমি অপেক্ষা একটু নিম্ন হইলে আরও ভাল হয়। পরে আধ হাত অন্তর এক এক খান মোতা কিম্বা বড় বড় পাশমুখী শারি বাঁধিয়া পুতিবে। উভয় শারির মধ্যে অন্যূন দেড় হাত জমি রাখিয়া দিবে। ঐ ফাকের মধ্য হইতে এক এক কোদাল মাটি লইয়া ঐ প্রোথিত বীজের উপর দিয়া যাইবে। তাহাতে বৃষ্টির জলে বীজ সকল পচিয়া যাইবে না। নদীয়া, ২৪ পরগণা, প্রভৃতি জিলায় হলুদের চাস অধিক নাই, যে দুই এক স্থানে আছে, তথায় উক্ত প্রণালীতে বীজ রোপণ করা হয় না। কোদালের ঠোকা দিয়া বিশৃঙ্খল ভাবে বীজ পোতা হয়। তাহাতে বীজ অধিক লাগে, ফলনে কম হয় এবং হলুদ তুলিবারও সুবিধা হয় না।

চারা বাহির হইলে জ্যৈষ্ঠ কিম্বা আষাঢ় মাসে ক্ষেত্র নিড়াইয়া উত্তমরূপে দাঁড়া বাঁধিয়া দিবে। যদি বর্ষার আধিক্যে ঘাস বেশি হয়, তাহা হইলে আশ্বিন মাসের মধ্যে আরও একবার নিড়াইয়া দেওয়া উচিত। অনেকের জানা আছে,

হলুদের গাছ গোরুতে খায় না, এটী সম্পূর্ণ সত্য কথা নহে। অনেক স্থলে হলুদের গাছ গোরুতে বিলক্ষণ খায়। যাহারা নাও খায়, তাহারা হলুদ-ক্ষেত্রের ঘাস খাইতে গিয়া পা দ্বারা কুটিয়া অধিক ক্ষতি করে। যাহাতে হলুদ-ক্ষেত্রে গোরু এক কালে যাইতে না পারে, সেইরূপ ব্যবস্থাই করিবে।

অগ্রহায়ণ মাস হইতে দুই একটী করিয়া গাছ শুকাইতে আরম্ভ করে। গাছ শুকাইলেই, হলুদ তুলিবার উপযুক্ত হয়। ভূমির অবস্থান এবং আবাদ অনুসারে, গাছ শুকাইতে এদিক ওদিক হইয়া থাকে। গাছ শুকাইলেই হলুদ তুলিতে পার, কিন্তু মাঘ মাসের প্রথম পক্ষের মধ্যে তুলিতে না হইলেই ভাল হয়। যাহাদের হলুদের আবাদ অধিক আছে, তাহারা অগ্রহায়ণের শেষ হইতেই তুলিতে আরম্ভ করে। হলুদ তোলার কিঞ্চিৎ অগ্র পশ্চাতে লাভ ও ক্ষতির অধিক ইতর বিশেষ হয় না। কারণ প্রথমে হলুদ যেমন কিছু কম উঠে, শুঁঠ হলুদ দমে ভারী হয় এবং শেষে হলুদ বেশি উঠে, কিন্তু শুঁঠ হাল্‌কা হয়।

হলুদ তুলিবার সময় ক্ষেত্রেই মোতা ও মুথী হলুদ বাছিয়া ফেলিবে। যদি আবশ্যক হয়, তবে বীজের উপযুক্ত বড় বড় পাশ-মুথীও ঐ সময়ে বাছিয়া ফেলিবে। বীজগুলি ছায়ায় তৃণ পত্র ঢাকিয়া রাখিবে এবং অন্য হলুদ গোময়-মিশ্রিত জলে সিদ্ধ করিবে; একবার উতলাইয়া উঠিবা মাত্র নামাইয়া ফেলিবে, বেশী সিদ্ধ হইলে নষ্ট হইয়া যাইবে। সিদ্ধ হলুদ রৌদ্রে শুকাইতে দিবে। মধ্যে মধ্যে উল্টাইয়া পাল্টাইয়া দিবে। ছোট ছোট হলুদগুলি প্রায় শুষ্ক হইয়া

আসিলে, তাহা হইতে বড়গুলি পৃথক করিয়া ফেলিবে। কারণ বড়গুলি শুকাইতে অধিক সময়ে লাগে। অর্দ্ধ শুষ্কাবস্থায় হলুদগুলি চট কিম্বা বাঁশের চাটায় রাখিয়া অনবরত রগ্‌ড়াইবে। প্রতিদিন অপরাহ্নে একবার রগ্‌ড়াইতে পারিলে ভাল হয়। পূর্ব্বাঞ্চলে একটী বংশ কিম্বা কাষ্ঠদণ্ডের অগ্রভাগে এক খণ্ড ক্ষুদ্র তক্তা যুড়িয়া তদ্দারা হলুদ রগ্‌ড়ায়। রগড়াইলে হলুদ পরিষ্কৃত, গোলাকার, অল্পায়ত ও ভারবিশিষ্ট হয়। উত্তম রূপে শুকাইতে ও রগ্‌ড়াইতে পারিলেই ভাল হলুদ তৈয়ার হয়।

হলুদের আবাদে বিঘা প্রতি চাসের খরচ ৬৲; বীজ ৮ মণে ৮৲, পাইট অর্থাৎ নিড়ানি ও দাঁড়া বাঁধা ৫৲, খাজনা ৫৲ এবং তৈয়ার খরচ ৫৲; মোট ২৯৲ টাকা। সচরাচর ২০৲। ২৫৲ টাকার বেশি লাগে না।

হলুদ প্রতি বিঘায় ২০ মণ হইতে ৩০ মণ পর্য্যন্ত উৎপন্ন হইতে পারে। দরও বৎসর বিশেষে ২৲ টাকা হইতে ৫৲ টাকা পর্য্যন্ত হইয়া থাকে। এই দ্বিবিধ উৎপন্ন ও দ্বিবিধ দরের মধ্যবর্ত্তী হইয়া হিসাব করিলে প্রতি বিঘায় গড়ে খরচ ও টাকার সুদ বাদেও ৫০৲ টাকা লাভ হইতে পারে।

# সপ্তদশ পাঠ।

## কপি।

কপি বিলক্ষণ সুস্বাদ ও পুষ্টিকর শাক; শীতকালে অনেকে আদর পূর্ব্বক আহার করিয়া থাকেন। কিন্তু রৌদ্র প্রখর হইলে আর উহা খাইতে ভাল লাগে না এবং তখন খাওয়া উচিতও নহে, তখন উহা পীড়াদায়ক হয়। কপি চারি প্রকার; বাঁধা, ফুল, ওল ও কাফ্রি কপি। তন্মধ্যে বাঁধা কপিই উৎকৃষ্ট। কাফ্রি কপি বাঁধে না, কোঁকড়া কোঁকড়া পাতা হয়, কিন্তু খাইতে ঠিক বাঁধা কপির মত।

কপির ভূমি ও আবাদ ঠিক গোল আলুব ন্যায়। কেবল উহার ভূমিতে কিছু খৈল দিলে ভাল হয়; কিন্তু খৈল দিলে আবার অধিক জলসিঞ্চন আবশ্যক হইয়া উঠে। এজন্য এদেশীয় কৃষকেরা কপির জমিতে প্রায় খৈল দেয় না। পলিমাটী, জল এবং নিরন্তর কোদাইল দ্বারা মাটী খুঁড়িয়া দেওয়া, এই তিনটীই কপির সর্ব্বস্ব।

কলিকাতা, দমদমা, বারাকপুব ইত্যাদি স্থানে কপির চারা ক্রয় করিতে পাওয়া যায়; কিন্তু চারা কিনিয়া কপির আবাদ করা পোষাইয়া উঠে না, এক বিঘার উপযুক্ত চারা কিনিতে ১৪।১৫ টাকা খরচ পড়ে। এই জন্য কৃষকেরা বীজ ক্রয় করিয়া চারা তৈয়ার করে। ২৲ টাকার বীজে এক বিঘার উপযুক্ত চারা তৈয়ার হইতে পারে। তবে চারা তৈয়ার করা কিছু কঠিন ব্যাপার। ভাদ্র মাসে খৈল ও গোবরের গুঁড়া মিশ্রিত পলিমাটীতে বড় বড় নিম্নছিদ্র নাদা

বা টব্ পূর্ণ করিয়া তাহাতে কপির বীজ বপন করিবে, মধ্যে মধ্যে জল দিবে। ঐ টবগুলি দিনমানে ছায়ায় এবং রাত্রে শিশিরে রাখা উচিত। কলার খোলার আচ্ছাদন দিয়া তাহাদিগকে রৌদ্র হইতে রক্ষা করিতে হয়। চারাগুলি ৪।৫ অঙ্গুলি পরিমাণের হইলে নাদা বা টব হইতে উঠাইয়া স্বতন্ত্র চৌকায় অপেক্ষাকৃত বিরল ভাবে রোপণ করিবে। সমস্ত ভাদ্রমাস চারাগুলিকে ঐ অবস্থায় রাখিয়া আশ্বিন মাসের প্রথমেই ক্ষেত্রে দেড় হাত অন্তর রোপণ করিবে। প্রত্যেক চারার মধ্যে ব্যবধান, ইহা অপেক্ষা কিছু বেশি হইলেই ভাল হয়। কেহ কেহ এরূপে চান করিয়া সমভূমি তৈয়ার করে যে, তাহার এক দিকে জল দিলে সমস্ত ভূমিই ভিজিয়া যায়। কিন্তু আলুর ক্ষেত্রের ন্যায় উভয় শারির মধ্যে নালী কাটিয়া দিলে জল সিঞ্চনের আরও সুবিধা হয়। কপির ক্ষেত্রে মাসে দুই বার জল সেচিয়া সমস্ত ভূমি ভিজাইয়া দিবে। যো হইলেই খুঁড়িবে।

এক বিঘা কপি করিতে হইলে ঐ ভূমিতে ফাল্গুন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত সাত মাসে অন্যূন ত্রিশটি চাস দিতে হয়, ইহাতে ৭॥০ টাকা খরচ পড়ে; মাটী তোলা ও সার দেওয়ায় দুই টাকা, বীজ ২৲ দুই টাকা, চারা পোঁতা ১৲ টাকা, জলসেচা ৪৲ টাকা, জমির খাজনা ৩৲ টাকা এবং অন্যান্য বাজে খরচ ১॥০ টাকা; মোট ২১৲ টাকা খরচ পড়ে। এক বিঘায় ১২০০ শত কপি তৈয়ার হইতে পারে। উহার মূল্য গড়ে /০ হিসাবে ৭৫৲ টাকা হয়। উহা হইতে খরচ ২১৲ একুশ টাকা বাদ দিলে ৫৪৲ টাকা লাভ থাকিতে

পারে। তবে উহাতে এই এক আপত্তি আছে যে, সর্ব্বত্র কপি খাইবার লোক নাই; সুতরাং সকল স্থানে কপির চাসে উক্তরূপ লাভ হইতে পারে না। এই আপত্তি খণ্ডনের জন্য যদি উহার গড় মূল্য ৵১০ আধ আনা ধরা যায়, তাহা হইলেও বিঘা প্রতি ২৭৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে। তাহাই বা কম কি?

---

# অষ্টাদশ পাঠ।

## আদা।

আদাও একটী প্রয়োজনীয় সামগ্রী। ইহা ঔষধার্থ যে পরিমাণে ব্যবহৃত হয়, খাদ্য রূপে সে পরিমাণে ব্যবহৃত হয় না। তাহা না হইলেও ইহার প্রয়োজন অল্প নহে। ইহার আবাদ ও খরচ ঠিক হলুদের ন্যায়; কিন্তু লাভ হলুদের অপেক্ষা অনেক বেশি। বিশেষতঃ ইহার আবাদে আর দুইটী সুবিধা আছে। আদার দাঁড়ার উপর বেগুন, লঙ্কা প্রভৃতি অন্যান্য ফসল হইতে পারে, অথচ তাহাদিগের ছায়ায় আদার কিছু হানি না হইয়া উপকারই হয়। আবার হলুদের ন্যায় উহাকে শুকাইয়া প্রস্তুত করিবার কোন গোলযোগই নাই। উহা প্রায় কাঁচা অবস্থাতেই বিক্রয় হইয়া যায়।

এক বিঘা ভূমিতে ন্যূন পরিমাণে ৫০ মণ আদা জন্মাইতে পারে। উহা সচরাচর অন্যূন ৪৲ চারি টাকা দরে বিক্রয় হইয়া

থাকে। উহা হইতে ঊর্দ্ধ পরিমিত খরচ ২৫৲ টাকা বাদ দিলেও ১৭৫৲ টাকা লাভ থাকিবার সম্ভাবনা।

অর্থোপার্জ্জনের এমন সকল উপায়, আমরা অবলম্বন করিবার চেষ্টা করি না!! একটী গল্প আছে, কোন সময়ে এক জন দরিদ্র ব্রাহ্মণকে কিছু অর্থ দিবার জন্য দেবতারা অভিলাষী হইয়া তাঁহার গম্য পথে কিঞ্চিৎ অর্থ রাখিয়া দিলেন। ব্রাহ্মণ সারা পথ বেশ আসিয়া সেই অর্থের নিকটবর্ত্তী হইয়াই "কাণারা কেমন করিয়া পথ চলে" ইহা পরীক্ষা করিবার জন্য চক্ষু মুদিয়া গেলেন, যেখানকার অর্থ সেইখানেই পড়িয়া রহিল। বোধ হয়, বাঙ্গালী জাতির এখন সেইরূপ চোক বুঁজিয়া চলিয়া যাইবার সময়।

---

## ঊনবিংশ পাঠ।

### পলাণ্ডু।

পলাণ্ডু, তরকারী ও মসলা এই উভয়ের মধ্যবর্ত্তী একটী উৎকৃষ্ট সামগ্রী। এদেশের অনেকে ইহাকে অপবিত্র খাদ্য মনে করিয়া থাকেন। মৃত্তিকাজাত অন্যান্য উদ্ভিদের ন্যায়, ইহাও একরূপ উদ্ভিদের অন্তর্ভৌম কাণ্ড ভিন্ন আর কিছুই নহে। অতএব ইহাতে অপবিত্রতার লেশ মাত্র নাই। ইহা অতিশয় পুষ্টিকর দ্রব্য, অধিক পরিমাণে আহার করিলে উষ্ণদেশীয় লোকদিগের কিছু অনিষ্ট হইতে পারে। এই জন্যই এ দেশে উহার আহার নিষিদ্ধ হইয়াছে। কিন্তু এখন আর অনেকে ঐ নিষেধ মান্য করেন না; অল্পে অল্পে উহার ব্যবহার আরম্ভ

করিয়াছেন। পলাণ্ডুর সহিত পাক করিলে কতকগুলি তরকারী, বিশেষতঃ মাংস অতি সুস্বাদ হইয়া থাকে। কিন্তু উহা আহার করিতে হিন্দুর আপত্তি আছে। যাহা হউক, উহা আহার করিতে আপত্তি থাকিলেও উহার চাস করিতে আপত্তি কি ?

আলু ও কপির ন্যায় পলাণ্ডুর পক্ষেও পলিমাটী বিশেষ উপযোগী। এই জন্য নদী ও খালের তীর-ভূমির কিম্বা চড়ায় উহার আবাদ হইয়া থাকে। যে সকল উদ্ভিদের কাণ্ডাদি অত্যন্ত সরস ও কাষ্ঠহীন, তাহার নিম্নে অল্প পরিমাণে বালুকা থাকিলে কোন হানি হয় না। কারণ বেলে মাটী বিলক্ষণ আল্‌গা হয়। পলাণ্ডু, পটোল, তরমুজ, উচ্ছে, কুমড়া, শশা, কাঁকুড় প্রভৃতি শস্য আল্‌গা মাটীতেই ভাল হয় এবং এই জন্য কৃষকেরা প্রায়ই বালুকাময় চর-ভূমিতে ঐ সকলের আবাদ করিয়া থাকে।

পিঁয়াজের চাসে বিঘা প্রতি মোট ২০৲ টাকার বেশী খরচ হয় না। ঐ খরচ বাদেও ১০।১৫৲ টাকা লাভ থাকিতে পারে।

উত্তম রূপে জমি প্রস্তুত করিয়া আশ্বিন মাসের শেষে কিম্বা কার্ত্তিকের প্রথমে ছয় অঙ্গুল জমির উভয় দিকে সারবন্দী করিয়া ছোট পিঁয়াজের এক একটী কলি পুতিবে। গাছগুলি ৪।৫ অঙ্গুলি হইলেই উভয় শ্রেণীর মধ্যে খুঁড়িয়া দিবে। এই খনন এক প্রকার বিশেষ কোদাইল দ্বারা করিতে হয়। উহা চারি অঙ্গুলি মাত্র চওড়া ; কেবল পিঁযাজের চাসেই উহার ব্যবহার হইয়া থাকে। শিশির দ্বারাই পিঁয়াজের পোষণ হয়। যদিই কোন কারণ বশতঃ ক্ষেত্র অতিশয় শুকাইয়া যায়, তবে দুই একবার জল সেচিয়া দিবে।

# বিংশ পাঠ।

## ধান্য।

ধান্য নানাবিধ। নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান, যশোহর প্রভৃতি কয়েকটী জিলায় ৫০ পঞ্চাশ প্রকারেরও অধিক ধান্যের আবাদ প্রচলিত আছে। এই সমস্ত ধান্য আশু, কার্ত্তিক-শাল, বোরো, জলি এবং আমন এই পাঁচ ভাগে বিভক্ত।

যে সকল ধান্যের আবাদ উচ্চ ভূমিতে হয় এবং যাহা শীঘ্র প্রস্তুত হইয়া থাকে, তাহাকে আশু বা আউশ কহে। আউশ ধানের মধ্যে সূর্য্যমণি, খুকনী, মধুমালতী, আগুনবাণ, সন্ধ্যামণি, কেলে কিম্বা ফেব্‌রি, লোহাগজাল, দলকচু, তুলসী-মঞ্জরী, পরাক্ষী, কাজলা, মুড়ে, পিপড়ে-শার, খেজুরছড়া ও চন্দ্রমণি এইগুলি প্রধান। ইহার মধ্যে সূর্য্যমণি, খুকনী, চন্দ্র-মণি ও মধুমালতী উৎকৃষ্ট। এই সকল ধানের কাহার কি বিশেষ গুণ আছে, কৃষকের তাহা জানা আবশ্যক। সূর্য্যমণি— ইহার ফলন বেশি এবং কিছুদিন জল না হইলেও সহসা ইহার অনিষ্ট হয় না। মধুমালতীও উত্তাপ সহিতে পারে। চন্দ্রমণি ফলে বেশি, কিন্তু বিলম্বে পাকে। সন্ধ্যামণি ও ফেব্‌রি এই দুই প্রকার ধান অতি শীঘ্র পাকে; এই জন্য কৃষকেরা চর ভূমিতে উহার আবাদ করিতে পারে। দলকচু মেটেল জমিতে হয়।

কার্ত্তিকশাল (কার্ত্তিকশালী) আউশের অপেক্ষা কিছু নিম্ন-ভূমিতে জন্মে। ইহাও একপ্রকার আমন। আউশ শ্রাবণ মাসে এবং আমন অগ্রহায়ণ মাসে পাকে। কার্ত্তিক শাল,

কার্ত্তিক মাসে পাকে, বোধ হয়, এই জন্যই উহার নাম কার্ত্তিক-শাল হইয়াছে। কেশেফুলও এইরূপ কার্ত্তিকশালী।

যে বৎসর বেশি বন্যা হইয়া বর্ষাকালে আমন ধানের ভূমি ডুবিয়া যায়, সেই বৎসর কৃষকেরা বোরো ধানের আবাদ করিয়া বিশেষ উপকার পায়। কারণ উহা জলা ও কাদা ভূমিতেই জন্মিয়া থাকে। ভাদ্র মাসে ক্ষেত্রের চারি দিকে বাঁধ দিয়া জল বাঁধিয়া রাখিতে হয়। কার্ত্তিক মাসে জমিতে চাস দিয়া ঐ ধান বুনিতে হয়। বোরো ধান মাঘ মাসের মধ্যেই পাকিয়া উঠে। আবার মাঘ মাস হইতে আষাঢ় মাসে ঐ জমিতে আমন ধান রোপণ করিতে পারা যায়। বোরোর গাছ, পাতা, ফল কিয়ৎ পরিমাণে মৃত্তিকাসাৎ হওয়ায় আমনের উপকার হয়। আমন ধানের ক্ষতি, বোরো দ্বারা কতক পোষাইয়া থাকে।

মাঘ ফাল্গুন মাসে নদীতে জোয়ারের জল যত দূর উঠে এবং ভাঁটার সময়ে যতদূর নামিয়া পড়ে, এই উভয় সীমার মধ্যবর্ত্তী ভূমিতে জলিধানের আবাদ হয়। ফাল্গুন মাসে একটা মরা কোটাল দেখিয়া ভাটার সময়ে সেই পলি কাদার উপর ধান পুতিতে হয়। ধান পোতার সময়ে যে কিছু পরিশ্রম ও ব্যয় প্রয়োজন; তদ্ভিন্ন ধান কাটার মধ্যে আর কিছু ব্যয় কি আর কোন কাজ করিতে হয় না। জ্যৈষ্ঠ মাসে ঐ ধান পাকিয়া উঠে।

আমন ধানই প্রধান ও বহুতর। আমন ধানের মধ্যে ধেণা-ফুল, বাঁশমতী, রামশালী, চামরমণি, পেশোয়ারি বা বোলদাড়, পাটনাইহুড়ো, পাতরকুচি, ডহরনাগরা, লোণা, নিনামা, করিম-

শাল, মাগুরশাল, ঝিঙ্গেশাল, ময়ুরশালী কিম্বা মৌল, বনগোঁটা, কৈযোড়, কেলে, ঘুড়ে কিম্বা উড়কি, কণকচুর, ছিলেট, পরমান্ন-ভোগ, বাঁশকাটা, ভাসাপাস্তী, মেঘি, মেনকি, ঘিকলা কেউটে-শাল, পাদশাভোগ, হরিনারায়ণ, মাঠচাল, পুদিনী, পানত্রাস, কালহানা, মুক্তাহার, মুগী, পূরবী, রাঙ্গমৌলা, বৌনাগরা, কৃষ্ণ-চূড়া, ওড়কচু, শালকেলে, আঁধারমাণিক, সফেদ কলমা এইগুলি প্রধান। ইহার মধ্যে আবার কৃষ্ণচূড়া, রামশালী, চামরমণি, বাঁশমতী, বেণাফুল, পাদশাভোগ ইত্যাদি কতকগুলি সরু ও ভাল। কৈয়োড় ধানের ফলন বেশি। ঘুড়ে, কণকচুর ও মেনকি এই ত্রিবিধ ধানে খৈ হয় এবং ইহার ফলন বেশি। এই কারণে ঐ কয়টী ধানে কৃষকগণের বেশ লাভ হইয়া থাকে। কিন্তু ঐ তিনটী, বিশেষতঃ কণকচুর ধান অত্যন্ত নাবি, মাঘ মাসের পূর্ব্বে পাকে না।

যে সকল জমিতে আমন ধান হইয়া থাকে, তাহাদের সাধারণ নাম শালী। আমন ধানের জমি অপেক্ষাকৃত কিছু নিম্ন হইয়া থাকে, যেহেতু তাহাতে বর্ষার জল অল্প বা অধিক পরিমাণে দাঁড়ান আবশ্যক। ঐ সকল জমিকে কৃষকেরা ডেঙ্গা, ডহর, বিলকাঁদুড়ে ও বিল এই চারি প্রকারে বিভাগ করিয়া থাকেন। সর্ব্ব প্রকার কার্ত্তিকশাল, কেলে ও ভেটে ইহারা ঐ ডেঙ্গায় জন্মিয়া থাকে। ভাসাপাস্তী, মেঘি, মাঠচাল, পুদিনি, আঁধারমাণিক, শালকেলে, পানত্রাস, কালহানা ও মুক্তাহার এইগুলি বিল বা বিলকাঁদুড়ে জমিতে জন্মিয়া থাকে। তদ্ভিন্ন প্রায় সমস্ত ধান্যই ডহর জমিতে হয়।

ময়মনসিংহ অঞ্চলে যে সকল ধান্য হয়, তাহাদিগকে পূরবী

ও মুগী কহে। বাখরগঞ্জ ও বরিশাল অঞ্চলে যে সকল ধান্য হয়, তাহাদিগকে বালাম কহে। হরিনারায়ণ ধান্য অতি উৎকৃষ্ট; উহা শ্রীহট্টে জন্মে।

উত্তর আমেরিকার অন্তর্গত কারোলিনা প্রদেশে এক প্রকার ধান্য জন্মে। তাহার বিশেষ গুণ এই যে, তাহা হইতে এক বৎসরের মধ্যে দুই বার ধান পাওয়া যায়। অন্যান্য ধানের ন্যায় অগ্রহায়ণ মাসে এক বার ধান কাটিয়া লইলে উহার যে গোড়া থাকে, তাহাতে একবার জল সেচিয়া দিতে হয়। কিছুদিনের মধ্যে ঐ সকল গোড়ার চতুর্দ্দিক হইতে বোগ বাহির হইয়া তাহাতে আবার ধান হয়। ঐ ধান মাঘ ফাল্গুন মাসে পাকিয়া উঠে। উহাতে অতি সামান্যরূপ কিছু পাইটের প্রয়োজন হয়।

বঙ্গদেশ ও পশ্চিমাঞ্চলের সর্ব্বত্রই শ্যামা, চিনে, কাওন বা কাম ইত্যাদি নামে আর একজাতীয় ধান্য জন্মিয়া থাকে। তাহা অতি অল্পায়াসেই প্রস্তুত হয়। ঐ সকল ধান অতি ছোট ও গোলাকার; উহার চাউল দেখিতে ঠিক ক্ষুদের ন্যায়। নিম্ন শ্রেণীর লোকেরা উহার অন্ন ব্যবহার করে। স্থল বিশেষে গো মহিষ প্রভৃতিকেও উহার ভাত খাওয়ান হইয়া থাকে।

কৃষি-পরাশরে ধান্যের বপন ও রোপণকাল সম্বন্ধে ব্যবস্থা আছে, পাঠকগণের অবগতি জন্য তাহার সংক্ষিপ্ত বিবরণ সংগৃহীত হইল;—

"বৈশাখে বপনং শ্রেষ্ঠং জ্যৈষ্ঠে তু মধ্যমং স্মৃতম্।
আষাঢ়ে চাধমং প্রাহুঃ শ্রাবণে চাধমাধমং॥"

বৈশাখ মাসে ধান্য বপন করাই মুখ্য কল্প। জ্যৈষ্ঠে মধ্যম,

আষাঢ়ে অধম এবং শ্রাবণে অতি অপকৃষ্ট কল্প। বৈশাখে,—অন্ততঃ জ্যৈষ্ঠে বপনের সুবিধা না হইলেই আষাঢ় কিম্বা শ্রাবণে বপন করিতে হয়; কিন্তু তাহা করা, আর না করা উভয়ই তুল্য। রোপণের ব্যবস্থা এইরূপ ;—

"রোপণার্থস্তু বীজানাং শুচৌ বপনমুত্তমং।
শ্রাবণে চাধমং প্রোক্তং ভাদ্রে চৈবাধমাধমং।"

আষাঢ় মাসে ধান্য রোপণ করিতে পারিলেই উত্তমরূপে শস্য জন্মে। শ্রাবণ মাসের রোপণেও কথঞ্চিৎ ফল পাওয়া যাইতে পারে। কিন্তু ভাদ্রেব বোপণ নিতান্ত বিফল হইয়া যায়।

ধান্যের চারা বাহির হইলে তাহাতে যথাকালে বিন্ধক, মদিকা ও নিড়ানী প্রয়োগের ব্যবস্থা এদেশীয় কৃষকগণের মধ্যে যেরূপে প্রচলিত আছে, তদ্দর্শনে বোধ হয়, এদেশে এক কালে কৃষিকার্য্যে পরাশরের ব্যবস্থা সম্যকরূপে অনুসৃত হইয়াছিল। এখনকার বিদেবাঁশী. কৃষিপরাশরের বিন্ধক মদিকা। বিদে বাঁশী ও নিড়ান কাড়ানের ব্যবস্থা কৃষি-পরাশবে যেরূপ দৃষ্ট হয়, বাহুল্য ভয়ে কেবল তাহার সংক্ষিপ্ত অনুবাদ মাত্র দেওয়া গেল। ধান্য-ক্ষেত্রে মই না দিলে সমভাবে শস্য জন্মে না। আষাঢ় ও শ্রাবণ মাসে ধান্য-চট্টন করিবে, অর্থাৎ ধান্য-ক্ষেত্রে বিদা দিবে; অবৃষ্টি হইলে ভাদ্র মাসেও বিদা চলিতে পারে। বিদা দ্বারা মাটী শল করিয়া না দিলে ধান ফলে না। আশ্বিন মাসে বিদা দেওয়ায় কোন ফল নাই। সম্যক্ প্রকারে কর্ষিত ভূমিতে ধান্য বপন বা রোপণ করিলেও যথাকালে সেই ভূমি তৃণশূন্য না করিলে সম্পূর্ণ শস্য হয় না। শ্রাবণ ও ভাদ্রে এক একবার এবং আশ্বিন

মাসের মধ্যে ছুইবার, ভূমিকে নিস্তৃণ করিতে পারিলে, সেই ভূমি কামধেনুবৎ ফল প্রসব করে।

ধান্তের চাস এদেশে এত সাধারণ যে, উহার চাস আবাদ কাটাঝাড়া ইত্যাদি ক্রিয়া প্রায় সকলেই অবগত আছেন। সুতরাং তাহার বিশেষ উল্লেখ অনাবশ্যক। তবে সংক্ষেপে দুই একটী কথা বলিয়া যাই। ধান্ত-ক্ষেত্রে যে সার দেওয়া আবশ্যক, তাহাও বঙ্গদেশের সকল স্থানের কৃষকেরা অবগত নহেন। খড়, বিচালি, চোনা, গোবর, ছাই ও মাটী এই গুলি একত্র পচিয়া যে সার হয়, ধান্তের পক্ষে তাহাই যথেষ্ট। যাঁহাদের ধানেব আবাদ আছে, তাঁহাদের সার-প্রকরণে কথিতানুরূপ এক একটা "সারকুড়" রাখা উচিত। মাঘ মাসে ভূমিতে ঐ সার দিয়া উত্তম রূপে চাস দেওয়া কর্ত্তব্য।

আমরা সার প্রকরণে ভূমি দগ্ধ করার উপদেশ দিয়াছি; কেন না, ভূমি দগ্ধ হইলে উর্ব্বরা হইয়া উঠে। বোম্বাই প্রেসিডেন্সির অন্তর্গত কঙ্কণ প্রদেশের কৃষকগণ আমন ধানের বীজ-ভূমি দগ্ধ কবিয়া থাকে। তাহারা যে প্রণালীতে ভূমি দগ্ধ করে, তদ্দেশে সেই প্রণালীকে রাব কহে। ধান কাটার পরই, যে ভূমিতে বীজ পাতিবে, সেই ভূমি দগ্ধ করিবার আয়োজন করে। প্রথমে শুষ্ক গোবর অর্থাৎ ঘুঁটে ভূমির উপর ঘন করিয়া সাজায়, তাহার উপর ডাল-পালা পাতা-লতা বিছাইয়া দেয়, তাহার উপর এক স্তর মৃত্তিকা স্থাপন করিয়া অগ্নি সংযোগ করে। ঐ ঘুঁটে ও ডাল পালা পোড়া ছাই এবং পোড়া মাটী মিশ্রিত হইয়া ভূমি বিলক্ষণ উর্ব্বরা হয়। বর্ষারম্ভের পূর্ব্বে বা এক পসলা বৃষ্টি হওয়ার পর, ঐ

ভূমিতে আমন ধানের বীজ বপন করে। বীজ-তলা ভিন্ন অন্য স্থানে রাবের ব্যবহার নাই। রাবের দ্বারা যে ধান্যের চারা প্রস্তুত হয়, তাহা অতীব তেজাল হইয়া থাকে। তাহার অল্প পরিমাণ চারায় অনেক ভূমি রোয়া হয়। বীজ-ভূমিতে আগাছা নিবারণই রাবের প্রধান উদ্দেশ্য। এই জন্য বোম্বাই প্রদেশের যে সকল স্থানে বীজ পাতার পর অবিরত বারিবর্ষণ হয়, সেই সকল স্থানেই বিশেষ রূপে রাবের চলন আছে। বঙ্গদেশে ঘাস ও খড়ের জমি ভিন্ন অন্য জমি দগ্ধ করার প্রথা নাই। ধান্য-ক্ষেত্রে রাবের পরীক্ষা করিয়া দেখিলে হয়।

ব্রহ্মদেশে সকল শস্য অপেক্ষা ধান্যের আবাদ অধিক। সম্প্রতি তথাকার রাজকীয় রসায়নাগারে এক আশ্চর্য্য পরীক্ষা হইয়া গিয়াছে। অস্থিচূর্ণ সাররূপে ভূমিতে দিয়া যে ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতে শ্বেতসারের ভাগ অধিক, এবং বিনা সারে যে ধান উৎপন্ন হয়, তাহাতে ধাতব পদার্থের ভাগ অধিক। ধাতব পদার্থ অধিক পুষ্টিকর। ধান্য অপেক্ষা গমে ধাতব পদার্থ অধিক বলিয়া গম অধিক পুষ্টিকর। ময়দা বা সবেদাকে পাতলা বস্ত্রখণ্ডে রাখিয়া ধৌত করিলে শ্বেতবর্ণ জল নিঃসৃত হয়। পুনঃপুন ধৌত করিতে করিতে ঐ জলের সহিত আর শুভ্রাংশ নির্গত হইবে না। পরিষ্কার জল বাহির হইতে থাকিবে। তখন বস্ত্রখণ্ডের উপর যাহা অবশিষ্ট থাকিবে, তাহাই ধাতব পদার্থ; আর ময়দা বা সবেদা ধোয়া জল স্থির হইলে, তাহার তলায় যে শ্বেতবর্ণ পদার্থ জমিবে, তাহাই শ্বেতসার। অধিক সার দিলে ধানে এই শ্বেতসার বৃদ্ধি হয়। আর সার না দিলে ধাতব পদার্থ বৃদ্ধি হয়। একবার বঙ্গদেশে এইরূপ পরীক্ষা হইলে, বঙ্গদেশীয়

ধান্য-ক্ষেত্রে সার দেওয়ার প্রয়োজন আছে কি না, তাহা নিশ্চয় হইতে পারে। যত দিন তাহা না হইবে, ততদিন এদেশীয় কৃষকগণ ধান্য-ক্ষেত্রে সার না দিয়া কিরূপে নিশ্চিন্ত থাকিতে পারে?

উক্তরূপ কর্ষিত ভূমিতে, বৈশাখ মাসের প্রথমে জল হইলে যো দেখিয়া ধান্য বপন করা, এদেশের চিরকালের রীতি। কিন্তু কোন কোন কৃষক জল হইবার পূর্ব্বেই ধূলা জমিতে ধান ছড়াইয়া রাখেন। জল হইলেই ঐ সকল ধানের চারা বাহির হয়। ঐ রূপে বোনা ধানের কিছুমাত্র ক্ষতি হয় না; বরং উহার বিশেষ লাভ এই যে, ঐ ধানে পোকা ধরে না এবং উহা ফলে বেশি। ইহাকে "কাঁকড়ি" কহে।

ধান্যক্ষেত্র স্বভাবতঃ অধিক উর্ব্বর হইলে, অথবা সারাদি দ্বারা তাহাকে অধিক উর্ব্বর করিয়া তুলিলে, কিম্বা জল-বায়ু উত্তাপের অনুকূলতা প্রযুক্ত দৈব পালনের আতিশয্য হইলে ধান 'ছড়িয়া' যায়। ধানের গাছ ও পাতার অতিশয় তেজ হইলে ফুল-ফলের ব্যাঘাত হয়। ইহাকে "ছড়িয়া" যাওয়া কহে। ইহা ধানের একটী উৎপাত। এই উৎপাত নিবারণের একটী সহজ উপায় আছে। ভূমির প্রতি কাঠায় /১ সের কি /১ সের হিসাবে লবণ ছড়াইয়া দিতে পারিলে, ঐ উৎপাত ঘুচিয়া যাইতে পারে। যখন ধানের চারাগুলি প্রায় এক হাত পরিমাণে বৃদ্ধি পায়, তখন প্রখর রৌদ্রের দিন লবণ ছড়াইতে হয়।

অনেকে বলেন ধানের চাসে বিশেষ লাভ নাই, তবে আমাদের সর্ব্বপ্রধান শস্য বলিয়া কৃষক মাত্রেরই উহার চাস করিতে

হয়। কিন্তু ধানের আবাদ, উৎকৃষ্ট প্রণালী পূর্ব্বক এককালে অধিক পরিমাণে করিতে পারিলে উহাতেও লাভ আছে। এই গ্রন্থের শেষ পৃষ্ঠায় ইহার খরচা ও লাভের হিসাব দেওয়া গিয়াছে।

---

# একবিংশ পাঠ।

## গম।

পৃথিবীর মধ্যে ধান্য ও গম এই দুইটী শস্যই মনুষ্যের প্রধান খাদ্য। ধান্যের চাস আবাদ বিংশ পাঠে বিবৃত হইয়াছে। এক্ষণে গমের আবাদ বিষয়ে কিছু বলা যাইবে।

বঙ্গদেশে গমের চাস অধিক নাই। তবে চব্বিশ পরগণা, যশোহর, খুলনা, মেদিনীপুর প্রভৃতি জিলার নিম্নভূমি সকলে অল্প পরিমাণে ঐ শস্যের আবাদ দৃষ্ট হয়। তাহারও পদ্ধতি সুন্দর নহে। ভারতবর্ষের উত্তর-পশ্চিমাঞ্চল, অযোধ্যা, মান্দ্রাজ প্রভৃতি স্থানে প্রচুর পরিমাণে গমের আবাদ হইয়া থাকে। কিন্তু ভিন্ন দেশে গমের রপ্তানি করিয়া ধনাগম করিতে হইলে, ভারতবর্ষ সদৃশ উর্ব্বর ক্ষেত্রে যে পরিমাণে গমের চাস হওয়া উচিত, তাহা হয় না। অথচ বিলাতে গমের অভাব দিন দিন বৃদ্ধি পাইতেছে; আবার সেখানকার গম চাসে স্থায়ী প্রকারের বিঘ্ন উপস্থিত হইয়াছে। বিলাতে যে পারিমাণ গম জন্মে, তাহা বাদে আমেরিকা ও রুষিয়া হইতে বর্ষে বর্ষে দশ কোটী মণ গম আমদানি হয়। ১৮৭০ সালে বিলাতে আমেরিকা

হইতে শতকরা ৬১ মণ, রুষিয়া হইতে ১০ মণ এবং ভারতবর্ষ হইতে ১ মণ গম আমদানি হইয়াছিল। কিন্তু ১৮৮৩ সালে আমেরিকা হইতে শতকরা ৪৬ মণ, রুষ হইতে ১৬৷৷০ মণ এবং ভারত হইতে ১৪ মণ গম আমদানি হইয়াছে। ভারত হইতে বিলাতে পাঁচ বর্ষ মধ্যে গম রপ্তানির অসাধারণ প্রকার বৃদ্ধি দর্শনে কৃষিবাণিজ্যবিৎ পণ্ডিতগণ অনুমান করিতেছেন যে, ক্রমশঃ ভারতবর্ষই বিলাতের গমের সমস্ত অভাব পূরণ করিবে। অতএব ভারতীয় কৃষকগণের ধান্যের ন্যায় গমের চাসে মনোযোগ করাও অতি আবশ্যক হইয়াছে।

১৮৮৫ সালে সমস্ত ইংরেজরাজাধিকৃত ভারতে ৭ কোটি ৮০ লক্ষ বিঘা ভূমিতে গমের আবাদ হইয়া ১৮ কোটি ৯০ লক্ষ মণ গম উৎপন্ন হইয়াছিল। তন্মধ্যে ভারতের প্রয়োজনীয় গম রাখিয়া কেবল ৩ কোটি সওয়া লক্ষ মণ গম রপ্তানি হইতেছে। আবার তাহার অর্দ্ধেকমাত্র বিলাতে যায়, অবশিষ্ট অন্যান্য স্থানে গিয়া থাকে। এদিকে বিলাতে ১২ কোটী মণ গমের অভাব। তাহার মধ্যে ভারতবর্ষ আপাততঃ দেড় কোটি মণ গম যোগাইতে পারিতেছে। বিলাতের অন্নসংস্থানের জন্য ভারতকে আর ১৷৷০ কোটি মণ গম অধিক উৎপন্ন করিতে হইবে। আর চারিকোটি বিঘা ভূমিতে গমের আবাদ বৃদ্ধি না হইলে ঐ পরিমাণ গম জন্মাইবার সম্ভাবনা নাই। এই ভূমি ভারতে আছে এবং চাস করিবার লোকও আছে; এখন করিয়া উঠিতে পারিলেই হয়।

ভাগলপুর ও অযোধ্যা অঞ্চলে যে প্রণালীতে গমের চাস আবাদ হইয়া থাকে, তাহাকে আদর্শ করিয়া বঙ্গদেশের উপ-

যোগী একটি গম চাষের সংক্ষিপ্ত প্রণালী আমরা এই স্থলে লিপিবদ্ধ করিলাম। ভরসা করি, বঙ্গদেশীয় কৃষকগণ তদবলম্বনে ফল পাইবেন।

বঙ্গদেশে চারি প্রকার জমিতে ধানের চাস হইয়া থাকে; ডেঙ্গা, ডহর, বিলকাঁদুড়ে ও বিল। ইহার প্রথম তিন প্রকার জমিতেই গমের চাস হইতে পারে। মসুর, মটর, জওয়ার, তিল ও ইক্ষু ইহার যে কোন শস্য কাটিয়া লওয়ার পরে সেই জমিতে গম হইতে পারে। কিন্তু এক বৎসর অন্তর নূতন আবাদি জমিতে গম করিতে পারিলেই ভাল হয়। পশ্চিমাঞ্চলীয় সঙ্গতিমান কৃষকেরা তাহাই করিয়া থাকেন।

যে ত্রিবিধ ভূমিতে গমের চাস করিবার কথা বলা হইয়াছে তন্মধ্যে যে সকল জমিতে বর্ষার জল উঠে, তাহাতে কোন প্রকার সার দিবার প্রয়োজন নাই; কেন না সে সকল জমিতে পলিমাটীই সর্ব্বোৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। ডেঙ্গা জমিতে সার দিতে হয়। বৈশাখ মাসে ১০। ১২ গাড়ি গোবরের সার ভূমিতে দিয়া এক পসলা বৃষ্টি হওয়ার পর লাঙ্গল দিয়া ছড়াইয়া দিতে হয়। নীলের সিঁঠি বা শণের সিঁঠি গমের উত্তম সার। বিশেষতঃ আর্দ্র ভূমিতে উহা ভিন্ন অন্য সার কার্য্যকর হয় না। ভাগলপুর অঞ্চলের কৃষকগণ গমের জমিতে আর এক প্রকার সার দেয়। তাহারা গোরুর পাল ছাড়া করিয়া ২। ১ দিন ভূমিতে রাখে। তাহাতে গোরুর মল মূত্রে জমির তেজ বৃদ্ধি হয়। গোরুর রাখাল তজ্জন্য বিঘাপ্রতি ২৲ দুই টাকা পায়।

ডেঙ্গা জমিতে অধিক চাস দেওয়া আবশ্যক হয়। বেলে

জমিতে ৫।৬ বার চাস দিলেই চলিতে পারে; কিন্তু মাটী শক্ত হইয়া গেলে ১০।১২ বার চাস না দিলে চলে না। এই-জন্য বর্ষার জল শুষ্ক হইবার এবং মাটী শক্ত হইবার পূর্ব্বেই গমের জমিতে চাস দিতে আরম্ভ করা উচিত। লাঙ্গলের সঙ্গে সঙ্গে ডেলা ভাঙ্গিবার জন্য মই দেওয়া আবশ্যক। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে মইয়ের পরিবর্ত্তে এক প্রকার গুরুভার কাঠ চারিটা বলদে টানিয়া থাকে। তদ্দ্বারা যেমন ডেলা ভাঙ্গে, তেমনি জমির ফাঁপ মরিয়া যায়। জমির ফাঁপ থাকিলে গমবীজ উত্তমরূপে কলায় না। ডহর জমিতে ১০।১২ বার লাঙ্গল দিতে হয়। গমের জমিতে প্রায়ই জল সিঞ্চন আবশ্যক হয়। এজন্য বপনের পূর্ব্বেই ভূমিতে তাহার ব্যবস্থা করিয়া রাখিতে হয়। সে ব্যবস্থা আর কিছুই নহে। জমিতে উত্তর হইতে দক্ষিণে ও পূর্ব্ব হইতে পশ্চিম কতকগুলা পিলি কাটিয়া রাখিতে হয়। কার্ত্তিকের শেষার্দ্ধ হইতে অগ্রহায়ণের প্রথমার্দ্ধ পর্য্যন্ত গম বপনের প্রশস্ত সময়। বীজ বপনের সময় আর একবার লাঙ্গল দিতে হয়। লাঙ্গলের পশ্চাৎ পশ্চাৎ দাগে দাগে বীজ বুনিয়া যাইতে হয়। বিঘাপ্রতি বীজের গড় পরিমাণ /২॥০ সের। অযোধ্যা অঞ্চলের কোন কোন কৃষক গম বপন কালে ২।১ এক রাত্রের জন্য রাখাল সহ ভেড়ার পাল ভাড়া করিয়া জমিতে বাস করিতে দেয়। তাহাদের মলমূত্রে জমির তেজ হয় এবং তাহাদের চলা ফিরাতে জমির ফাঁপ মরিয়া যায়। এইরূপ অনুষ্ঠান গমের পক্ষে বিশেষ উপকারজনক বলিয়া বিলাতী কৃষকেরা ভেড়ার ক্ষুরকে স্বর্ণময় বলে। বপনের পর লাঙ্গল বা মই দিয়া বীজ ঢাকিয়া দিতে হয়। উত্তর পশ্চিমাঞ্চলে গমের জমি নিড়ানর

প্রথা প্রায় নাই; কিন্তু আগাছা পরিষ্কার না করায় তাহাদের যে ক্ষতি হয়, তাহারা তাহা বুঝিতে পারে না। ধান্ত ক্ষেত্রের ন্যায় গমের ক্ষেত্রও উত্তমরূপে নিড়াইয়া দেওয়া উচিত।

বিলকাঁছুড়ে জমিতে সেচনের প্রয়োজন হয় না। ডেঙ্গা ও ডহরে সেচ দিতে হয়। প্রথম সেচ অঙ্কুর উদ্গমের বিংশতি দিবস পরে, দ্বিতীয় সেচ থোড় হইলে এবং তৃতীয় সেচ শীষ বাহির হইলে দিতে হয়। কৃষকেরা অবস্থা বুঝিয়া দুই কিম্বা একবার সেচ দিলেও চলিতে পারে; কিন্তু তিনবার দিতে পারিলেই ভাল হয়। বোম্বাই প্রদেশীয় ভাদ গ্রামের থামারে পরীক্ষা হইয়াছে যে, কঠিন দায়া নামী গমে সেচ আবশ্যক নহে, তাহাতে সেচ দিলে এবং যাহাতে আবশ্যক, তাহাতে না দিলে, গমের বিলক্ষণ হানি হয়। এ প্রদেশে উক্ত দ্বিবিধ গমের অতিশয় ফলন হয়। বঙ্গদেশেও ঐ গমের চাস করা উচিত।

পশ্চিম বায়ু, পৌষমাসে অল্প অল্প বৃষ্টি এবং পরিষ্কার আকাশ, গমের পক্ষে শুভজনক। পূর্ব্ববাতাস ও অস্বচ্ছ মেঘ, গমের অনিষ্টকর। ইহা ব্যতীত নানাপ্রকার রোগ, অনিষ্টকর উদ্ভিদ্ ও কীট, গমের বিলক্ষণ ক্ষতি করিয়া থাকে। গমের রোগ যাহাতে না হয়, বপনকালে তাহার উপায় করা যাইতে পারে এবং সে উপায় ভাদ গ্রাম থামারে পরীক্ষিত হইয়াছে। মনুষ্য মূত্র, তুঁতে বা লবণ মিশ্রিত জলে বীজ ভিজাইয়া বপন করিলে, রোগ কম হয়। তুঁতের জল সর্ব্বাপেক্ষা উপকারক।

চৈত্রের শেষ বা বৈশাখের প্রথমে গম কাটিতে হয়। ফলে বপনের পর চারি বা সাড়ে চারি মাসের মধ্যে গম পাকিয়া

উঠে। গম কাটা, ঝাড়া, মাড়া ইত্যাদি ক্রিয়া ঠিক ধান্তের ন্যায়। উহর জমির ফলন ১০/ মণ এবং ডেঙ্গা ও বিল জমির গড় ফলন ৫/০ মণ পর্য্যন্ত হইয়া থাকে।

---

# দ্বাবিংশ পাঠ।

## ইক্ষু।

ইক্ষু একটী প্রধান শস্য; কারণ গুড়, চিনি, মিশ্রি প্রভৃতি সকলই উহা হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। বিবেচনা পূর্ব্বক উহার আবাদ করিতে পারিলে, এবং সুজন্মা হইলে ইহা হইতে প্রচুর লাভও হইতে পারে। ইক্ষু হইতে লাভ, বেশি না হইলেও চাস আবাদ সকলেরই জানা আবশ্যক।

যে দো-আশ মৃত্তিকায় চিক্কণের অংশ কিছু বেশি, তাদৃশ মৃত্তিকাই ইক্ষু চাসের উপযুক্ত। মাঘ মাসে জমিতে উত্তম রূপে চাস দিয়া তাহাতে গোবরের সার এবং খৈল ও অস্থিচূর্ণ ছড়াইয়া দিবে। কোন কোন স্থানের কৃষকেরা আকের জমিতে দেওয়াল ভাঙ্গা মাটীও দিয়া থাকেন। খৈল যেন বেশি মাটীর নীচে না পড়ে এবং এক বিঘায় ১৷০ মণের অধিক দিবার প্রয়োজন নাই। বৈশাখের পূর্ব্বেই ভূমিতে ৭।৮ বার লাঙ্গল ও মই দিয়া রাখিবে। বৈশাখের প্রথমে জল হইয়া যো হইলে একবার চাস দিবে। পরে এক কি দেড় হাত অন্তর কোদাল দ্বারা খুপি কাটিয়া তাহাতে জল দিয়া ২।৩ খানি আকের বীজ রোপণ করিবে। মধ্যে মধ্যে জল দিবে এবং

ছাগল গোরুতে মুখ দিতে না পারে, তদ্বিষয়ে বিশেষ দৃষ্টি রাখিবে। তাহাতে বিশেষ অনিষ্ট হয়। গোড়ার মাটী শুকাইয়া গেলে, উই ধরিয়া সমস্ত বীজ নষ্ট করিয়া ফেলে। এই জন্য মধ্যে মধ্যে গোড়া খুঁড়িয়া খৈলের গুঁড়া ও জল দিতে হয়। প্রত্যেক গাঁইট হইতে পাতা বাহির হইয়া গাছগুলি লাগিয়া গেলে উইতে আর বড় কিছু করিতে পারে না। গাছগুলি বড় হইয়া উঠিলেও যদি দীর্ঘ কালের মধ্যে জল না হয়, তাহা হইলে দাঁড়া বাঁধিয়া সমস্ত ইক্ষু-ক্ষেত্রে ২। ১ বার জল সেচিয়া দেওয়া আবশ্যক হয়।

কোন কোন কৃষক বীজ সকলকে "হুমকোর" মধ্যে না রাখিয়া এক বারেই চৈত্র মাসের ধূলিময় ক্ষেত্রে রোপণ করেন। তাহাতে ইক্ষু মন্দ হয় না। মধ্যে মধ্যে জল দেওয়া আবশ্যক হয় বলিয়া কৃষকেরা প্রায়ই নদী বা খালের ধারে ইক্ষুর চাস করিয়া থাকেন। প্রতিবার নূতন জমিতে আকের চাস করিতে পারিলেই ভাল হয়; নচেৎ মাঘ ফাল্গুনে পুরাতন আক কাটিয়া ২। ১ মাসের মধ্যে উত্তম আবাদ হইয়া উঠে না। এই জন্য এবার যে জমিতে আক করা যায়, আর বার, তাহার গোড়া হইতেই নূতন আক তৈয়ার করিবার চেষ্টা করাই উচিত। বেশি আবাদ করিতে ইচ্ছা হইলে, নূতন জমিতে কার্ত্তিক মাস হইতে চাস দিতে আরম্ভ করিতে হয়।

ইক্ষুর বীজ, ইক্ষু চাসিদিগের বাটীতে ক্রয় করিতে পাওয়া যায়। কিন্তু সে বীজ বড় ভাল হয় না, তাহারা ভাল বীজ সকল নিজ আবাদের জন্য রাখিয়া, অবশিষ্ট বেচিয়া ফেলে। এই জন্য, যাঁহারা ইক্ষুর আবাদ করিতে ইচ্ছা করেন, তাঁহাদের

স্বয়ংই আকের বীজ তৈয়ার করিতে শিক্ষা করা উচিত। ফাল্গুন মাসে ইক্ষু কাটিয়া তাহার মাঝামাঝি ছেদ করিবে। গোড়ার অংশগুলি মাড়িয়া ফেলিবে, আগার অংশগুলি একটা শীতল স্থানের বড় গর্ত্তের মধ্যে কাদা করিয়া তাহাতে নিক্ষেপ করিবে। তাহার উপর অনেক পাতা কিম্বা খড় বিচালি চাপা দিবে। মধ্যে মধ্যে গোবর মিশ্রিত জল তাহার উপর ঢালিয়া দিবে। ঐ গর্ত্তকে হাপর কহে। হাপোরের চতুর্দ্দিকে বাবলা কিম্বা কুলের কাঁটা দিয়া রাখিবে। নহিলে শিয়ালে সব নষ্ট করিয়া ফেলে। এই রূপে কুড়ি পঁচিশ দিন রাখিলে, ঐ সকল ডগার প্রায় প্রতি গাঁইটের উপর দিকে পত্র-মুকুল এবং নীচের দিকে শিকড় বাহির হয়। তখন উহাদিগকে হাপোর হইতে তুলিয়া খণ্ড খণ্ড করিয়া কাটিবে। ঐ সকল খণ্ডে যেন ২।৩টী করিয়া গাঁইট থাকে। উহাদিগকে আর একটী অপেক্ষাকৃত ছোট ও গভীর গর্ত্তে ফেলিয়া উপরে তৃণ পত্র চাপা দিয়া মধ্যে মধ্যে জল দিবে। এই গর্ত্তকে "হুমকো" কহে। ১০।১২ দিন "হুম্‌কোতে" থাকিলে পূর্ব্বোক্ত পত্রমুকুল সকল বৃদ্ধি প্রাপ্ত হইয়া ছোট বাঁশের নীলের আকার ধারণ করে। ঐ সকল ইক্ষু-খণ্ডকেই বীজ কহে।

ইক্ষুর গাছ এক কিম্বা দেড় হাত পরিমাণের হইলেই উহার পাতাগুলি গাছের গায়ে জড়াইয়া দিতে আরম্ভ করিবে। গাছ যত বড় হইবে, ততই জড়াইতে থাকিবে। যখন গাছ সকল এত বড় হয় যে, বাতাসে হেলিয়া পড়িতে পারে, তখন নিকট-বর্ত্তী চারিটী গাছ একত্র বাঁধিয়া দিবে। নতুবা ঝড়ে কিম্বা প্রবল বাতাসে আকের বিলক্ষণ হানি হয়। ফাল্গুন মাসে

ইক্ষু কাটিয়া গুড় বাহির করিতে হয়। ইক্ষুর গাছও অনেক বিক্রয় হইয়া যায়।

যদি ইক্ষু কাটিয়া লইয়া গোড়া রাখা যায় এবং মধ্যে মধ্যে আবাদ করিয়া জল সেচিতে পারা যায়, তাহা হইলে ঐ সকল মূল হইতেও অনেক ইক্ষু জন্মিয়া থাকে। চীনদেশীয় আকের এক একটা গোড়া হইতে প্রায় কুড়ি গাছ করিয়া নূতন ইক্ষু বাহির হয়। চীনদেশীয় ইক্ষুর আবাদ করাই সর্ব্বাপেক্ষা সুবিধা-জনক; কারণ ঐ আকের ফলন বেশি। ঐ আকের আর একটী বিশেষ গুণ এই, উহা অতিশয় শক্ত। এই জন্য উহাতে পোকা ধরিতে পারে না। আক দুই প্রকার শাদা ও কাজলা। কাজলা আকের মধ্যে যেগুলি সরু ও শক্ত তাহাই চীনদেশীয়।

এক বিঘা আকের জমির খাজনা ৫৲, চাস আবাদ ৪৲, পোঁতা ১৷৷০, জল সেচা ১৷৷০, পাতাজড়ান ১২৲, মাড়াই ৬৲, এবং জ্বালানি ১৲; মোট খরচ ৩১৲ একত্রিশ টাকা। এক বিঘায় ১০ মণ গুড় হইতে পারে। এ মণ, প্রচলিত মণের প্রায় দ্বিগুণ। দর ৮৲ হিঃ ৮০৲ টাকা। ৩১ টাকা খরচ বাদে ৪৯ টাকা লাভ থাকিতে পারে। না মাড়িয়া আকের গাছ বিক্রয় করিলেও ৩০ ত্রিশ টাকা লাভ থাকে।

ইংরাজাধিকৃত ব্রহ্মদেশে ইক্ষু চাসের বিলক্ষণ প্রাচুর্য্য দৃষ্ট হয়। সেখানে সাধারণতঃ দুই প্রকার ইক্ষুর চাস হয়। এক প্রকার কাঁচা খাইবার জন্য এবং অন্য প্রকার গুড়ের জন্য। কাঁচা খাইবার জন্য যে আকের চাস হয়, তাহাতে কোনক্রমে গুড় হয় না। তাহা কলের মধ্যে দিলে পাঁপে পাঁপে ভাঙ্গিয়া

খণ্ড খণ্ড হইয়া যায়। আর এক প্রকারে যথেষ্ট পরিমাণে গুড় হয়। এদেশ অপেক্ষা ব্রহ্মদেশে ইক্ষু চাসে লাভ বেশি; এবং চাস আবাদেও অনেক ভিন্নতা আছে। বিহারের কৃষকগণ উদ্ভিদ্ বিশেষের শিকড়ের এবং রেড়ির বীজের ক্কাথ দ্বারা ইক্ষু গুড়ের গাদ কাটায়। তাহাতে গুড় শীঘ্র পরিষ্কার হয়।

---

# ত্রয়োবিংশ পাঠ।

## তামাক।

গুড়ুক, চুরট, নস্য ইত্যাদি নানা প্রকারে তামাক প্রচুর পরিমাণে ব্যবহৃত হইয়া থাকে সুতরাং উহার আবাদ ও বাণিজ্যে বিলক্ষণ লাভ হয়।

তামাকের জমি সমান ও উত্তমরূপে কর্ষিত হওয়া আবশ্যক। তামাকের জমিতে অন্য ফসল না করিয়া ফাল্গুন হইতে ভাদ্র পর্য্যন্ত মাসে দুই তিন বার লাঙ্গল ও মই দেওয়া উচিত। রঙ্গপুর অঞ্চলে ভাদ্র ও আশ্বিন মাসের মধ্যেই ২০।২১ বার চাস দিয়া থাকে। ফলতঃ পুনঃ পুনঃ চাস দিয়া তামাকের জমির মৃত্তিকাকে ধূলিবৎ করা, সকল দেশেই আবশ্যক। কৃষির প্রণালী, সকল দেশে একরূপ নহে। এই বঙ্গদেশের মধ্যেই ভিন্ন ভিন্ন জিলায় বিভিন্ন প্রকার কৃষি-প্রণালী। তবে পরস্পর নিকটবর্ত্তী জিলা সকলে প্রণালীগত ভিন্নতা বড় লক্ষিত হয় না এবং সকল দেশেরই কৃষি-প্রণালীর মূল-যুক্তি একরূপ। নদীয়া, ২৪ পরগণা, যশোহর, রঙ্গপুর, পাবনা, হুগলি, মুরসিদাবাদ, বর্দ্ধমান প্রভৃতি জিলা সকলের কৃষি প্রণা-

ণীকেই প্রধান লক্ষ্য করিয়া এই গ্রন্থ প্রণীত হইয়াছে; সুতরাং অদূরবর্তী দেশস্থ কৃষি প্রণালীর সহিত; স্থল বিশেষে ইহার কিঞ্চিৎ বৈশাদৃশ্য দৃষ্ট হওয়া অসম্ভব নহে।

এ দেশে তামাক-ক্ষেত্রে গোবর ও তৃণ পচা সারই কৃষকেরা যথাসাধ্য দিয়া থাকে। উহার সহিত কিয়ৎ পরিমাণে ছাই এবং লবণ বা সোরা মিশাইলেই তামাকের পক্ষে উৎকৃষ্ট সার প্রস্তুত হইতে পারে। ব্রহ্মদেশের তামাক অতি উৎকৃষ্ট ও বিখ্যাত। সেখানে তামাকে ঐ সারই ব্যবহার করা হইয়া থাকে। নদীয়া জেলার অন্তর্গত কোন কোন স্থলের কৃষকেরা ক্ষেত্রে কেবল মাত্র পলিমাটী তুলিয়া উৎকৃষ্ট তামাক প্রস্তুত করে। নীলের হাউজ্ হইতে যে পচা নীলের গাছ ফেলিয়া দেয়, তাহা তামাকের জমিতে ফেলিয়া দিলে উৎকৃষ্ট সারের কার্য্য করে। ঐ সকল কাঠ যখন ক্ষেত্রে ফেলা যায়, তখন উহার উপর মাটী দেওয়া উচিত।

তামাক নানাবিধ। পানমুটী, হরিণপালী, হাতিকানী, জটাভাং বা শিবজটা, কপি, শকুনকানী, কালীজিবে, ছোটনা, কৃষ্ণকলি, মান্দাহা, সিন্দুরখটুয়া, ভেলেঙ্গি, চামা, নয়োখোল ইত্যাদি আরও অনেক আছে। কেহ কেহ বলেন, ভিন্ন ভিন্ন প্রকার তামাকের ভূমি ও আবাদ বিষয়ে কিছু কিছু ভিন্নতা আছে। থাকে,—থাকুক। ফলতঃ একই প্রণালীতে সকল প্রকার তামাকের আবাদ করিলে ফলাংশে বড় তারতম্য হয় না। পানমুটী তামাকের আকার ঠিক পানের ন্যায়। হরিণ-পালী তামাকের পাতা অপ্রশস্ত ও সূচলাগ্র। কতকগুলি পত্র-যুক্ত গাছটীর সহিত, হরিণ-শৃঙ্গের কিঞ্চিৎ সাদৃশ্য আছে।

এইরূপ অন্যান্য তামাকের নামের দ্বারা যাহার সহিত সাদৃশ্যের বোধ হয়, বাস্তবিকই তাহার সহিত ঐ সকল তামাকের সাদৃশ্য আছে। কালীজিবে তামাক, ঠিক কালী ঠাকুরাণীর জিবের ন্যায়।

মেটে ঘরের পুরাতন পোঁতার, কিম্বা সম্পূর্ণ সসার ভূমিতে উত্তম রূপে চাস দিয়া ভাদ্র মাসে তামাকের বীজ বপন করিয়া পদাঘাতে ঐ ভূমি চাপিয়া দিবে। চারা বাহির হইয়া ৩।৪টী পাতা হইলেই তাহা ক্ষেত্রে রোপণ করিবে। যতদিন চারাগুলি উত্তম রূপে না লাগে, ততদিন বিবেচনা পূর্ব্বক জল দিবে। পরে আর বিশেষ কারণ ব্যতিরেকে জলের প্রয়োজন হইবে না।

এদেশের মধ্যে যে সকল ভূমি সমতল এবং তাহার মধ্যে আবার যে গুলি দো-আঁশলা, তাহাতেই সচরাচর তামাক করিয়া থাকে। কিন্তু রঙ্গপুর অঞ্চলে উচ্চ ভূমির মধ্যে যে গুলি দো-আঁশলা, তামাক তাহাতেই উত্তম রূপে এবং অধিক পরিমাণে জন্মে। শিলা বৃষ্টি তামাকের বিশেষ অনিষ্টকর। ঐ অনিষ্ট নিবারণের কোন উপায়ও নাই।

তামাকের শারি দড়ি ধরিয়া বেশ সোজা করিয়া পুতিতে হয়। প্রত্যেক গাছের অন্তর দুই হাতের কম না হয়। নদীয়া ও ২৪ চব্বিশ পরগণার নানা স্থানে উৎকৃষ্টরূপে হিঙ্গিলি তামাকের চাস হইয়া থাকে। ঐ তামাক গাছের অন্তর, পাঁচ পোয়ার অধিক করা হয় না; কিন্তু আটাল ভূমির তামাক তিন পোয়া অন্তরেও রোপণ করা হইয়া থাকে। গাছগুলি ভূমিতে লাগিয়া গেলে অতিশয় সাবধানে ফাঁকে ফাঁকে লাঙ্গল দিবে। এই লাঙ্গল সোজা, এড়ো ও কোণাকোণি সকল প্রকারেই

দিবে। অতি সতর্কতার সহিত এরূপে বারবার নিড়াইয়া দিবে যেন, তামাকের ক্ষেত্রে মোটে ঘাস হইতে না পায়। যদি ভূমিতে অধিক রস থাকে, তাহা হইলে ঐরূপ লাঙ্গল তিন চারি বার দিবে (১)। তামাকের গাছে দশ বারটী পাতা হইলে, গাছের অগ্রভাগটী এবং নীচের তিন চারিটী পাতা ভাঙ্গিয়া দিবে। প্রত্যেক পত্রকক্ষ হইতে যে কুঁড়ি বাহির হইবে, তাহা সপ্তাহে সপ্তাহে ভাঙ্গিয়া দিবে। এই সময়ে পূর্ব্বোক্ত লাঙ্গলের দাগ সকল মিশাইয়া দিবে। পাতার বাড়িবার সম্ভাবনা থাকিতে থাকিতেই যদি ভূমি শুষ্ক হইয়া যায় এবং জল না হয়, তবে তামাক ক্ষেত্রে জল সেচিয়া দিবে। পাতার রঙ্ কাল হইলে এবং বাড়িবার সম্ভাবনা না থাকিলে, আর জলের প্রয়োজন থাকে না। যখন বুঝিবে যে, পাতা পাকিয়া উঠিতেছে, তখন আর একবার এরূপে নিড়াইয়া দিবে যেন, গাছের মূল শিকড় ভিন্ন আর অন্যান্য যাবতীয় শিকড়গুলি কাটিয়া যায়। তাহাতে তামাকের পাতা উত্তম রূপে তৈয়ার হয়।

হিঙ্গিলি গ্রাম নিবাসী সভারাম মণ্ডল তামাকের স্থষ্টিকর্ত্তা। হিঙ্গিলি ও তন্নিকটবর্ত্তী গাজীপুরের ন্যায় তামাকের চাস কোথাও হয় না। ঐ স্থানের কৃষকেরা পলি ও বোদ মাটীর দ্বারা তামাকের ভূমি তৈয়ার করে।

মাঘের শেষে কিম্বা ফাল্গুনের প্রথমে পাতাগুলি লাল হইলেই তামাক কাটিবে। পাতাগুলি এরূপে কাটিবে যেন,

---

(১) কিন্তু হিঙ্গিলির চাসে এরূপে লাঙ্গল চলে না এবং উত্তরাঞ্চলীয় তামাকের ন্যায় নিড়ানী-কার্য্যও করিতে হয় না।

তাহার সহিত কাণ্ডেরও কিয়দংশ থাকিয়া যায়। দুই এক দিন ক্ষেত্রে রাখিয়া কাঁচা থাকিতে থাকিতেই পাতা সকল গৃহে আনিবে। চারিটী করিয়া পাতা একত্র বাঁধিয়া বাঁশ কিম্বা দড়ার উপর শুকাইবে। এমন স্থানে শুকাইতে দিবে যেন, দিনে রৌদ্র ও রাত্রে শিশির লাগিতে পারে। কিন্তু ঐ তামাকে যাহাতে কিছুমাত্র ঝড় বৃষ্টি না লাগে, তদ্বিষয়ে বিশেষ সতর্ক হইবে। এইরূপে ৩।৪ দিন শুকাইলে অতি প্রত্যূষে কিম্বা কোয়াসার দিনে ঐ সকল তামাক মইয়ের উপর, গোড়াগুলি উভয় প্রান্তে রাখিয়া উপরি উপরি সাজাইবে। মধ্যস্থলে একটা বাঁশ দিয়া ঐ বাঁশের দুই প্রান্ত মইয়ের সহিত বাঁধিবে। ইহাকেই "জাত" দেওয়া কহে। ২।৩ দিন প্রাতে রাখিয়া পুনরায় খুলিয়া পূর্ব্ববৎ বাঁশে শুকাইবে। উত্তমরূপে শুষ্ক হওয়ার পর ঘরের মধ্যে মাচার উপর পালা দিয়া সাজাইবে। এইরূপে ১০।১২ দিন রাখিয়া হালা, ঝাড়া বা পোছা ইত্যাদি রূপে বাঁধিবে। পরে নীচে উপরে চট দিয়া পাটী ও হালা তৈয়ার করিবে।

এদেশে প্রতি বিঘায় তিন পাটী পর্য্যন্ত তামাক জন্মে। দুই পাটীতে এক ছালা। খরচ বাদেও তামাকের চাসে প্রতি বিঘায় ভালরূপ উৎপন্ন হইলে, এক শত টাকা লাভ হইতে পারে। খরচ ১৫৲ টাকার অধিক হয় না।

কিন্তু হিঙ্গিলি তামাক তৈয়ারের প্রণালী এবং উহার ব্যয় ও লাভের প্রণালী একটু স্বতন্ত্র। রঙ্গপুর, দিনাজপুর, পাবনা প্রভৃতি উত্তরাঞ্চলীয় তামাক চাসের বিবরণই অধিক লিখিত হইল। হিঙ্গিলির পাতা প্রস্তুত হইলে গাছগুলি কাটিয়া

খোলায় শুকাইতে হয়। যেমন যেখানে, ধান্যাদি শস্যের ঝাড়াই মাড়াই হয়, সেই স্থানকে খামার কহে; সেইরূপ যে স্থানে তামাকের কার্য্য হয়, তাহাকে তামাকের খোলা কহে। খোলায় তামাক শুকাইতে দুই দিন হইতে চারি দিনের অধিক লাগে না। যে তামাক উত্তমরূপে পাকে, তাহা অল্প রৌদ্রে এবং যে তামাক কাঁচা থাকে, তাহা অধিক রৌদ্রে শুকাইতে হয়। পরে গাছগুলিকে একরূপ দন্তহীন ক্ষুদ্র ক্ষুদ্র কস্তিয়া দ্বারা ছেদন করিতে হয়। প্রত্যেক খণ্ডে দুইটী হইতে চারিটী পর্য্যন্ত পাতা রাখিতে হয়। অনন্তর সেইগুলিকে গোছাইতে হয়। এইরূপে গোছান তামাকগুলিকে গোশালা বা শূন্য ঘরের মধ্যে খড়ের দড়ির উপর ঝুলাইয়া দিতে হয়। এই অবস্থায় প্রায় এক দেড় মাস থাকে, পরে পূর্ব্বোক্ত প্রণালীতে পাটী ও হালা বাঁধিতে হয়। হিঙ্গিলি তামাক বিঘাপ্রতি তিন হইতে পাঁচ পাটী পর্য্যন্ত উৎপন্ন হয়। দুই পাটীতে এক হালা। প্রতি হালা ১৬৲ টাকা মূল্যে বিক্রীত হয়। হিঙ্গিলি তামাকের চাসে বিঘা প্রতি ৮৲ টাকার অধিক খরচ পড়ে না।

# চতুর্ব্বিংশ পাঠ।

## পান।

পানের আবাদেও বেশ লাভ আছে। এদেশে যাহারা পানের আবাদ করে, তাহাদিগকে বারুই কহে। অন্যান্য কৃষকেরা পানের আবাদ প্রায় করে না, কিন্তু করায় কিছু মাত্র আপত্তি নাই। পানের আবাদের খরচ ও বিক্রয়ের লাভ বিশেষ রূপে স্থির করিতে পারা যায় না, কিন্তু এরূপ শুনা যায়, এক বিঘা জমিতে পানের আবাদ করিয়া খরচ বাদে এক বৎসরে ১৫০৲ দেড় শত টাকা লাভ থাকিতে পারে। এক বিঘা পানের আবাদের উৎপন্ন হইতে একটী সামান্য গৃহস্থ প্রতিপালিত হইতে দেখা গিয়াছে। পান নানাবিধ; তন্মধ্যে মণ্ডলঘেটে ও মঘাই পানই উৎকৃষ্ট।

বঙ্গদেশের মধ্যে নদীয়া, ২৪ পরগণা, হুগলী, বর্দ্ধমান প্রভৃতি অনেক জিলার স্থানে স্থানে পান জন্মিয়া থাকে। তন্মধ্যে হাবড়ার দক্ষিণ অংশে এবং গঙ্গা ও কাঁসাই নদীর মধ্যবর্ত্তী ভূভাগে উৎকৃষ্ট পান জন্মে। যে ক্ষেত্রে পানের আবাদ করে, তাহাকে কাছিম-পিঠে করিতে হয়। পলিমাটী-যুক্ত দো-আঁশ ক্ষেত্রে পানের চাস হয়। পানের ক্ষেত্রে খৈলের সারও ব্যবহৃত হইয়া থাকে। জমিকে এরূপ না করিলে বর্ষার জল পানের গোড়ায় বসে এবং তাহাতে গাছের বিশেষ অনিষ্ট হয়। প্রবল বায়ু, রৌদ্র ও ঝটিকাতেও পানের হানি হয়; এই জন্য ক্ষেত্রের চতুর্দ্দিক কচা, চিতে, জেবল, জীবন প্রভৃতি সজীব গাছের দ্বারা উত্তমরূপে ঘেরিতে হয় এবং খড়ি, খাঁকড়া,

কেঁশে প্রভৃতির, ঝাঁপ বাঁধিয়া ঐ বেড়া সংলগ্ন করিয়া ক্ষেত্রের উপরও ঢাকিয়া দিতে হয়। ভূমিতে সরু খাত করিয়া ঐ খাতের উভয় পার্শ্বে দাঁড়া বাঁধিয়া দাঁড়ার উপর ফাল্গুন কি চৈত্র মাসে পানের মূল কিংবা ডগা পুতিতে হয়। ভূমি পরিষ্কৃত রাখা, মধ্যে মধ্যে জল সেচা এবং পানের লতা সকল টানিয়া ও গোছাইয়া দেওয়াই পানের প্রধান পাইট। ঐ আলের এক পাশে শর বা খড়ির জাপ্‌রি বাঁধিয়া দিতে হয়। পানের লতা সকল ঐ জাপ্‌রি বহিয়া মাচার উপর উঠে। পাকা পানই ব্যবহার-যোগ্য, এই জন্য লতার গোড়া হইতে পান ভাঙ্গিতে আরম্ভ করে। পানের জমিতে অধিক চাস দিতে হয় না। ইহার প্রমাণস্বরূপ বঙ্গদেশীয় কৃষকেরা একটী প্রবাদ আবৃত্তি করিয়া থাকেন। যথা,—

"শতেক চাসে মূলা,
তার অর্দ্ধেক তুলা;
তার অর্দ্ধেক ধান,
বিনা চাসে পান।"

# পঞ্চবিংশ পাঠ।

## আওলাত।

বঙ্গদেশীয় গৃহস্থগণের স্থাবর সম্পত্তি সচরাচর ভূমি, আওলাত ও জলকর, এই তিন ভাগে বিভক্ত। যে সকল স্থানে বাড়ীর ভাড়া চলে, সেখানে বাটীও একটী লাভজনক সম্পত্তি। আওলাত সামান্যতঃ ফলের বাগান, গড়ন কাঠ ও আকয় বা জ্বালানি, এই তিন ভাগে বিভক্ত হইতে পারে। ফলের বাগানেরও কিয়দংশ গড়ন কাঠ এবং অবশিষ্টাংশ জ্বালানি হয়। গড়ন কাঠের মধ্যে যাহাতে গড়ন হয়, তাহা বাদে অবশিষ্টাংশ জ্বালানি হয়।

ফলের বৃক্ষের মধ্যে আম, কাঁটাল, নারিকেল, তাল, কলা, স্থপারি, আনারস, লিচু, আতা, পিয়ারা, নেবু ইত্যাদি কতকগুলি প্রধান। গড়ন কাঠের মধ্যে শেগুন, শিশু, বাবলা, আম, ঝাউ, দেবদারু, বকুল, বাদাম, বাঁশ, পুঁয়ো, নিম, বেল ইত্যাদি কতকগুলি প্রধান। যে সকল গাছে গড়ন হয় না, কেবল জ্বালানি হয়, তাহার মধ্যে জীবন পিটুলী, শাঁড়া, আঁকড়া, লোনা, ভীতরাজ ইত্যাদি কতকগুলি সচরাচর দেখা যায়। ইহাদিগের উৎপাদনে কাহারও কিছুমাত্র যত্ন করিতে হয় না, ইহারা আপনিই হইয়া থাকে। যে সকল কাঠ প্রায়ই জ্বালানি কার্য্যে লাগিয়া থাকে, তাহাদিগের মধ্যেও কোন কোন কাঠে কদাচিৎ গড়ন হয়; যেমন লোনা, ভীমরাজ, জেবল ইত্যাদি। এই সকল গাছ যদিও আপনিই হয়, তথাপি যাহাতে উহারা

কার্য্যের উপযুক্ত হইবার পূর্ব্বেই মারা না যায়, তদ্বিষয়ে দৃষ্টি রাখা আবশ্যক। খেজুর ও বাবলা এই দুইটী গাছ আপনিই হয়, বিশেষ যত্নের অপেক্ষা রাখে না। কারণ উহাদিগের কাঁটা সকল একটু শক্ত হইয়া উঠিলে আর গোরু বা ছাগলে খাইতে পাবে না; এই জন্য অনাবৃত ক্ষেত্রের যেখানে সেখানে ঐ দুইটী গাছকে আপনিই হইতে দেখা যায়। ফল-বৃক্ষের মধ্যে আম, কাঁটাল, বেল ও তাল কাঠে বেশ গড়ন হয়। বাঁশে যদিও কারুকার্য্যযুক্ত উৎকৃষ্ট গঠন হয় না, কিন্তু প্রায় সকল লোকের পক্ষেই ইহা অন্যান্য গঠন কাষ্ঠ অপেক্ষা অধিক কাজে লাগে। বিশেষ কৃষকের পক্ষে ২।৪টী বাঁশ ঝাড় নিতান্ত আবশ্যক। কৃষিকার্য্যে বাঁশের বিলক্ষণ প্রয়োজন।

উদ্ভিদ্‌বিদ্যায় সামান্যতঃ যাবতীয় উদ্ভিদের দুইটী ভাগ আছে। এক ভাগের নাম একবীজদল, অন্য ভাগের নাম দ্বিবীজদল উদ্ভিদ্। অঙ্কুর হইবার সময়ে যে সকল উদ্ভিদের বীজ হইতে একটী পাতা বাহির হয়, তাহাদিগকে এক-বীজদল এবং যাহাদের বীজ হইতে দুইটী পাতা বাহির হয়, তাহাদিগকে দ্বিবীজদল উদ্ভিদ্ কহে। কোন্ উদ্ভিদ্ কোন্ ভাগের অন্তর্গত, তাহা উহাদিগের মূল দেখিয়া ঠিক করা যায়। যাহারা একবীজদল, তাহাদিগের মূল আঁশাল অর্থাৎ একাকার কতকগুলি শিকড় গোড়ার চারিদিক হইতে বাহির হয় এবং মাটীর অধিক নিম্নে যায় না, তাহাদিগকে অপ্রকৃত শিকড় কহে। যেমন ওল, পিঁয়াজ, বাঁশ নারিকেল ইত্যাদি। যাহারা দ্বিবীজদল, তাহাদিগের প্রধান কাণ্ড ক্রমশঃ সূক্ষ্ম হইয়া মূল শিকড় রূপে মাটীর বহুদূর নিম্নে গমন করে; ঐ মূলশিকড়ের

গাত্র হইতে বহুসংখ্যক শিকড় দ্বৈভাগিক প্রণালীতে চতুর্দ্দিকে বিস্তৃত হয়, তাহাদিগকে প্রকৃত মূল কহে। একটী শিকড় দুই ভাগে বিভক্ত, আবার সেই দুইটী চারিভাগে, সেই চারিটী আট ভাগে ইত্যাদি নিয়মে শিকড় বিভক্ত হওয়ার নাম দ্বৈভাগিক প্রণালী। আম, কাঁটাল, বেল, পিয়ারা ইত্যাদি বৃক্ষের মূল প্রকৃত ও দ্বৈভাগিক। বড় বড় গাছের মধ্যে ঐ দুইটী ভাগ জানিতে পারিলে উহাদিগের আবাদে বিশেষ উপকার পাওয়া যায়। কারণ যাবতীয় একবীজদল উদ্ভিদ্ দোআঁশলা মাটীতে এবং যাবতীয় দ্বিবীজদল উদ্ভিদ্ আঁটাল মাটীতে ভাল হয়। কোন কোন স্থলে এই সাধারণ নিয়মের কিছু কিছু ব্যভিচার থাকিতে পারে।

নারিকেল ও সুপারি রসা ভূমিতে ভাল হয়। এই জন্য বর্ষাকালে যে সকল স্থলে পুনঃ পুনঃ জল বাধে এবং ২।৪ দিনের মধ্যেই ঐ জল মরিয়া যায়, সেই সকল বালুকাযুক্ত নিম্ন ভূমিতে ঐ দুই প্রকার গাছ রোপণ করিবে। যদি কিছু উচ্চ ভূমিতে নারিকেল পুতিতে হয়, তাহা হইলে তাহার মূলদেশ যাহাতে বার মাসই আর্দ্র থাকে, এরূপ ব্যবস্থা করিবে। প্রতি বৎসরেই গাছের শুষ্ক বাইল ও মোচ কাটিয়া দিবে। প্রথম ২।১ বৎসর নারিকেল ফলিতে দিবে না, মোচ বাহির হইলেই কাটিয়া ফেলিবে। পরে যত মোচ পড়িবে, তাহার কতক রাখিয়া, কতক কাটিয়া ফেলিবে তাহার অবশিষ্ট কাঁদি সকল বড় বড় হইবে। নারিকেল গাছ মাটীতে রোপণ করার পর অনেক দিন পর্য্যন্ত তাহার গোড়ায় বীজ নারিকেলটী থাকে এবং তাহার সমস্ত বহির্ভাগ মূলের দ্বারা আচ্ছন্ন হয়। গাছের গোড়ায় যত

দিন ঐ বীজ নারিকেলটী থাকে, তত দিন গাছের ভাল তেজ হয় না, এই জন্য অতি সাবধানে ঐ মালাটী কাটিয়া দিতে হয়,—ইহার নাম "নারিকেলের পিলে কাটা" কহে। পিলে কাটার পর গাছের তেজ বৃদ্ধি হয়। ডাব যতই কাটিবে, গাছের ফলন ততই বেশি হইবে। যাবতীয় বড় বড় গাছের বীজ ও চারা জ্যৈষ্ঠ মাসের মধ্যেই রোপণ করা উচিত। বাঁশের মূড়া চৈত্রের শেষ কিম্বা বৈশাখের প্রথমে একটু হেলাইয়া পুতিবে ও মধ্যে মধ্যে জল দিবে। বাঁশ আরও এক প্রকারে তৈয়ার করা যাইতে পারে। এক খানি নূতন বাঁশ লম্বালম্বি এক হাত মাটীর নীচে পুতিয়া মধ্যে মধ্যে জল দিতে হয়। কিছু দিন পরে ঐ বাঁশে যত গুলি গিরা থাকে, প্রায় তাহার সমুদায় গুলি হইতেই নূতন কঞ্চি বাহির হয়। পর বৎসর বর্ষারম্ভের কিছু পূর্ব্বে নূতন কঞ্চিযুক্ত গিরাগুলি উভয় পার্শ্বে কাটিয়া উপযুক্ত স্থানে পুতিয়া দিলেই উহা হইতে এক এক ঝাড় নূতন বাঁশের সৃষ্টি হইতে পারে।

প্রায় সকল প্রকার ফল ও ফুলের গাছেরই কলম হইয়া থাকে। শাখা কলম, গুটি কলম, যোড় কলম, জিবে কলম প্রভৃতি কলম নানা প্রকার। কোন্ কলম কোন্ সময়ে কিরূপে করিতে হয়, তাহার বিশেষ বিবরণ "কলম" প্রকরণে বিবৃত হইয়াছে। কিন্তু কলমের চারা সকল লাভাংশে তত উপযোগী নহে। তবে কলমের চারায় অন্যান্য বিষয়ে অনেক উপকার পাওয়া যায়। বীজের দোষ গুণে চারার ফল ফুল অনুরূপ হইয়া থাকে। কিন্তু যে গাছ হইতে কলম করা যায়, কলমের চারায় ঠিক তাহার ন্যায় ফল ফুল জন্মে। যে সকল উদ্ভিদের বীজ অঙ্কুরিত

হইতে সময় লাগে, তাহাদের চারা তৈয়ার করিতে হইলে কলম ভিন্ন উপায় নাই। অধিকাংশ ফলের চারা অন্ততঃ তিন বৎসরের পূর্ব্বে ফলে না। কিন্তু কলমের চারা যে বৎসর রোপণ করা যায়, সেই বৎসরই তাহাতে ফল হয়; কেহ কেহ বলেন, যে সকল গাছের ফল ফুল মোটে হইতেছে না, তাহার শাখা কিম্বা চক্ষু কলম করিলে অবাধে ফুল ফল হইবে। এ বিষয়টী পরীক্ষা করিয়া দেখা সকলেরই কর্ত্তব্য। কলমের চারার প্রধান দোষ দুইটী। প্রথম, ইহাতে অধিক ফল হয় না। দ্বিতীয়, অধিকাংশ কলমের চারাকে বাঁচাইয়া রাখা এবং অধিক কাল স্থায়ী করা কিছু কঠিন হয়।

আম, কাঁটাল, তেঁতুল, নারিকেল, সুপারি ইত্যাদি কতকগুলি বৃক্ষের বাগান এক বার তৈয়ার হইয়া গেলে বহুকাল থাকে এবং যে বৎসর না ফলে কিম্বা ঝটিকাদি দৈব ব্যাঘাত ঘটে, সেই বার ভিন্ন প্রতি বৎসরই কিছু কিছু লাভ পাওয়া যায়। এমন স্থলে কাঁটালের বাগান করিও না, যেথানে বন্যার জল উঠিতে পারে, কারণ বন্যার জল গোড়ায় লাগিলে কাঁটালের গাছ বাঁচে না। কতকগুলি ফল অপেক্ষাকৃত অধিক লাভজনক। বিশেষতঃ কলিকাতা প্রভৃতি বড় বড় সহরের নিকটবর্ত্তী স্থানে ঐ সকল ফলের বাগানে বিশেষ লাভ হইয়া থাকে। এমন কি, এক একটী চারি পাঁচ বিঘার বাগান দ্বারা অনেক গৃহস্থের সংসারযাত্রা নির্ব্বাহ হইয়া থাকে। নেবু, পিয়ারা, আনারস, কলা, পেঁপে, লিচু, বিলাতী কুল ইত্যাদি। নেবু, পিয়ারা, লিচু, কুল ইত্যাদির গাছ গড়ে ন্যূনসংখ্যায় ১০ দশ টাকা হিসাবে বিক্রয় হইতে পারে। আনা-

রসের চাসে বেশ সুবিধা। ইহার জন্য পৃথক্ জমি কি আবাদ-খরচের প্রয়োজন হয় না। অন্যান্য ফলের বাগানের মধ্যে শীতল জমিতে উহার আবাদ হইতে পারে। এক বিঘার বাগানে এক হাজার আনারসের গাছ হয়। এক কি দুই বৎসর বাদে যদি গাছসংখ্যার অর্দ্ধেক পরিমাণেও আনারস ফলে এবং তাহা গড়ে এক আনা হিসাবে বিক্রয় হয়, তাহা হইলে ত্রিশ টাকা হয়। এক বিঘা ফাঁকা জমিতে আড়াই হাজার আনারসের গাছ হইতে পারে। তাহার ফলন ও আয় ঐ হিসাবে হইলে প্রায় আশী টাকা হয়। তাহা হইতে ২৫ টাকা খরচ বাদ দিলেও ৫৫৲ টাকা লাভ থাকে।

গড়ন কাঠের মধ্যে শেগুন, শিশু, তুঁদ, গাম্ভীর, শিরীষ, চট্‌কা ইত্যাদি কতকগুলি বৃক্ষ যত্নপূর্ব্বক রোপণ ও পালন করিতে হয়। আড়া, বরোগা, দ্বার, জানালা ইত্যাদি বিশেষ প্রয়োজনীয় গড়ন সকল প্রধানতঃ শাল ও শেগুন কাঠ হইতে তৈয়ার হয়। কিন্তু শাল বৃক্ষের আবাদ সাধারণ লোকে করিতে পারে না। উহা পার্ব্বতীয় অঞ্চলে আপনিই হইয়া থাকে। ঐ সকল অঞ্চল যে রাজা বা জমিদারের অধিকারভুক্ত, উক্ত শালবনও তাঁহারই সম্পত্তি। ঐ সকল গাছের মধ্যে শিশু অতিশয় বৃদ্ধিশীল, ৫।৬ বৎসরের মধ্যে বৃক্ষ সকল প্রকাণ্ড হইয়া উঠে। ঐ সময়েই গাছগুলি গড়ে ৮৲ টাকা মূল্যে বিক্রয় হইতে পারে। বার বৎসরের পর শিশুর গড় মূল্য ৩০৲ টাকা হইয়া থাকে।

যে জমিতে শেগুন গাছের আবাদ করা যায়, তাহা ঈষৎ লবণাক্ত হইলে ভাল হয়, নিম্ন ও জলাভূমিতে ঐ গাছ ভাল

হয় না। যে ভূমিতে স্বভাবতঃ উলু খড় প্রভৃতি কঠিন তৃণ কিম্বা বিবিধ বন্ত গাছড়া জন্মে, তাহা শেগুন গাছের পক্ষে ভাল নহে। প্রথমে কিছু ঘনরূপে শেগুন গাছ পোঁতা উচিত; তাহাতে গাছ সকল সরল হয় এবং ঝটিকা হইতে রক্ষা পায়। এক বিঘা জমিতে প্রথমে ৪৪০টা শেগুন গাছ হইতে পারে। নানা কারণে উহার ১০০ গাছ মরিয়া যায়। অবশিষ্ট ৩৪০টীর মধ্যে প্রথম দশ বৎসরে ১৭০টী ১৲ এক টাকা হিসাবে ১৭০ টাকা, দ্বিতীয় দশ বৎসরের মধ্যে ৮৫টী ৪৲ টাকা হিসাবে ৩৪০৲ টাকা, ২৫ বৎসরের পর ৩৪টী ৮৲ টাকা হিসাবে ৩৪৪ টাকা এবং ৩০ বৎসরের পর অবশিষ্ট ৪৩টী ২০ টাকা হিসাবে ৮৪০ টাকা, মোট ১৬৯৪৲ টাকা বিক্রয় হয়। উহা হইতে মোট খরচ ৫৯০৲ টাকা বাদ দিলে ১১০৪৲ টাকা থাকে।

আজ কাল বাবলা গাছে বেশ লাভ হইতেছে। কারণ বাবলা কাঠে মুড়া, নিজেন, ধুরা, হাঁড়ি, চাকা ইত্যাদি অনেক দ্রব্য হয়। বাবলা গাছ দশ বৎসরের হইলেই উহার গড় মূল্য ১০ টাকা হইতে পারে। বাগানের চারি ধারে গগার দিয়া তাহার পাশে যে মাটী উচ্চ করিয়া রাখা হয়, সেই তোলা মাটীর উপর বাবলা, খেজুর ও জীবন গাছ দিয়া রাখিলে বিনা ব্যয়ে অনেক টাকার সম্পত্তি হইতে পারে।

## ষড়্‌বিংশ পাঠ।

### জমি জমা।

জমি প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত, ভিটা ও মাঠান। ভিটা বাস্তু, উদ্বাস্তু ও বাগাৎ এই তিন প্রকার। উদ্বাস্তুকে কোন কোন দেশে পালানও কহিয়া থাকে। যে স্থলে লোকে ঘর দ্বার নির্ম্মাণ পূর্ব্বক বসবাস করে, তাহাকে বাস্তু কহে। বাস্তুর নিকটবর্ত্তী স্থানকে উদ্বাস্তু কহে। গ্রামের মধ্যে বা প্রান্তে যে সকল স্থলে লোকের বাগান থাকে, তাহাকে বাগাৎ কহে।

মাঠান জমি প্রথমতঃ দুই ভাগে বিভক্ত; শালী ও শুনা। শুনাকে হর-ফসলীও কহিয়া থাকে। কোন কোন দেশে উক্ত দ্বিবিধ জমিকে যথাক্রমে জল জমি ও কালা জমি বলে। যে জমিতে আমন ধান হয়, তাহাকে শালী, আর যাহাতে আউশ ধান, সরিষা, তিসি, ছোলা, মটর অরহর, মুগ ইত্যাদি শস্তের আবাদ হয়, তাহাকে শুনা কহে। শুনা জমি ভিটা জমির সহিত সমতল, শালী অপেক্ষাকৃত নিম্ন। উর্ব্বরতানুসারে শালী ও শুনা প্রত্যেকে চারি প্রকার। যথা; আউয়েল, স্বয়েম, ছুয়েম, ও চাহারাম্। আমন ধানের জমির মধ্যে যাহা সর্ব্বোৎকৃষ্ট তাহাকে শালী আউয়েল কহে। শুনা জমির মধ্যে যাহা সর্ব্ব-নিকৃষ্ট, তাহাকে শুনা চাহারাম্ কহে। ঐ চারিটী শব্দকে যথা-ক্রমে প্রথম, দ্বিতীয়, তৃতীয় ও চতুর্থ শব্দ দ্বারা ব্যক্ত করিলেও হইতে পারে।

আমন ধানের জমি নিম্নতানুসারে ডেঙ্গা, ডহর, বিল-কাঁদুড়ে ও বিল এই চারি ভাগে বিভক্ত। কোন কোন দেশে

আমন ধানের জমিকে জল ডেঙ্গা, জল বালি, জলপলি, জলদন ও মেট্যাল এই পাঁচ ভাগে ভাগ করিয়া থাকে। যাহাতে বর্ষা-কালে জল দাঁড়ায় না, কিন্তু আল বাঁধিয়া জল রাখিলে আমন ধানের আবাদ হইতে পারে, তাহাকে ডেঙ্গা কহে। যে জমিতে অল্প অরিমাণে বালি মিশ্রিত থাকে এবং বর্ষাকালে জল দাঁড়ায়, তাহাকে ডহর কহে। বিলের চতুঃপার্শ্বস্থ জমি, যাহাতে অল্প পরিমাণে জল প্রায়ই থাকে, তাহাকে বিলকাঁদুড়ে কহে। যে সকল অনতিগভীর নিম্ন ভূমি পূর্ব্বে নদী কিম্বা দীর্ঘিকার গর্ভ ছিল এবং যাহাতে বার মাস কিম্বা বৎসরের অধিকাংশ সময় জল থাকে, তাহাকে বিল কহে।

জমা অর্থাৎ জমির খাজনা সকল দেশে সমান নহে। যে দেশে কৃষি কার্য্য করিবার উপযুক্ত জমি অল্প, কৃষকসংখ্যা বেশি এবং যেখানকার জমিতে অধিক লাভজনক শস্যের আবাদ হয়, সে খানে জমির খাজনা অধিক হইয়া থাকে। যেখানে কৃষি কার্য্যের উপযুক্ত জমি অধিক, সে খানে জমির খাজনা অল্প হইয়া থাকে। এইটী খাজনার ন্যূনাধিক্য হইবার সাধারণ নিয়ম। হুগলী, ২৪ পরগণা, বর্দ্ধমানের পূর্ব্ব অংশ এবং মুরশি-দাবাদ এই কয়েকটী স্থানের বিঘা প্রতি গড় খাজনা ৫৲ পাঁচ টাকা। নদীয়া, ঢাকা, ফরিদপুর, পুর্ণিয়া, বাঁকুড়া, মানভূম ইত্যাদি জিলার গড় খাজনা ।৶০ আনা।

ভূমির অবস্থা, পরিমাণ, খাজনা ইত্যাদি বিষয়ে কৃষকের সাধারণ জ্ঞান থাকা আবশ্যক। কোন্ ভূমি ভাল কি মন্দ এবং কোন্ ভূমি শস্যের পক্ষে উপযুক্ত, ইহা জানা না থাকিলে কৃষি-কার্য্যে লাভ করা কঠিন হইয়া থাকে। ভূমির আকার ত্রিভুজ

চতুর্ভুজ, পঞ্চভুজ, কাহার এক দিকের দৈর্ঘ্য অল্প, কাহার এক দিকের বিস্তার অধিক, কেহ গোলাকার ইত্যাদি নানাবিধ। কি রূপে ঐ সকল ভূমির মাপ এবং কালি করিতে হয়, তদ্বিষয়ে কৃষকের স্থূল জ্ঞান থাকিলেই চলিতে পারে। জমির জরিপ ও পরিমিতি বিষয়ে সূক্ষ্ম জ্ঞান সচরাচর প্রয়োজনে লাগে না। শুভঙ্করী জরিপ এবং বিঘাকালি, কাঠাকালি, জমাবন্দি ইত্যাদি হিসাবগুলি জানিয়া রাখিলেই যথেষ্ট হয়। দুর্ভাগ্যবশতঃ এ দেশের যাবতীয় কৃষকই প্রায় নিরক্ষর; এই সকল বিষয়ে তাহাদিগের প্রয়োজন মত জ্ঞান না থাকায় তাহাদিগকে নিয়তই প্রতারিত হইতে হয়।

কৃষকেরা জমিদারের নিকট হইতে সচরাচর মৌরসি, মিয়াদি ও উঠবন্দী এই তিন প্রকার বন্দোবস্তে জমি লইয়া থাকে। এক প্রকার নিরিখে চিরকালের জন্য ভূমির স্বত্ব ভোগ করিতে দেওয়াকে মৌরসি কহে। পাঁচ, সাত, কিম্বা দশ বৎসর মিয়াদে জমি ভোগ করিতে দেওয়াকে মিয়াদি স্বত্ব কহে। এক বৎসরের জন্য জমি ভোগ করিতে দেওয়াকে উঠবন্দী কহে। মৌরসি বা মিয়াদি পাট্টা লওয়া দরিদ্র কৃষকের পক্ষে প্রায় ঘটে না; কারণ তাহাতে এক কালে কিছু অধিক ব্যয় করিতে হয়। একাদিক্রমে বার বৎসর ভোগ করিলে ভূমিতে প্রজাগণের দখলিস্বত্ব জন্মে বলিয়া জমিদারেরা এখন প্রায়ই ৫।৭ বৎসরের অধিক মিয়াদে জমি ভোগ করিতে দেন না। যে জমি হস্তান্তর করিতে পারা যায় না, কিন্তু সময়ে সময়ে যাহার খাজনা বাড়াইতে পারা যায়, তাহাকে দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট ভূমি কহে। ভূমিতে কৃষকের স্থির স্বত্ব থাকা উচিত, তাহাতে ভূমির

উন্নতি সহকারে কৃষির উন্নতি হইয়া থাকে। অন্ততঃ দখলিস্বত্ব বিশিষ্ট ভূমি থাকাও ভাল। কিন্তু মধ্যে মধ্যে ভিন্ন ভিন্ন হাতে বন্দবস্ত করিতে পারিলে জমিদারের লাভ আছে, এজন্য প্রায়ই ভূমিতে প্রজার দখলি স্বত্ব হইতে পায় না। কৃষকগণের মধ্যে যাঁহারা পারিয়া উঠেন, তাঁহাদিগের মৌরসি কিম্বা মিয়াদি বন্দবস্তে ২।১টী জমা রাখা উচিত। তদ্ভিন্ন কৃষিকার্য্যের সুবিধা হইতে পারে না। এই জন্য প্রায়ই কৃষকগণের ২।১ টী কিছু বেশি টাকার জমা থাকে।

---

# সপ্তবিংশ পাঠ।

## কৃষির যন্ত্রাদি।

লাঙ্গল, কোদাল, মই, বিদা, নিড়ানি, কাস্তে, খন্তা, দা, সেউনি, ও ডোঙ্গা এ দেশীয় কৃষি কার্য্যে সচরাচর এই যন্ত্রগুলি ব্যবহৃত হইয়া থাকে। ইহার মধ্যে কার্য্যবিশেষে ২।১ খানি বিশেষ যন্ত্র আবশ্যক। হলুদ ও আদা তুলিবার জন্য এবং নূতন জমি ভাঙ্গিবার জন্য দোঁড়ে কোদালের প্রয়োজন হয়। পলাণ্ডুর পাইট করিবার জন্য চারি অঙ্গুল প্রশস্ত এক প্রকার কোদাইল আবশ্যক হয়;—ইত্যাদি।

বর্ত্তমান কালে যেরূপ লাঙ্গল ও মই ব্যবহৃত হয়, তাহার অবস্থা বড় ভাল নহে। ঐ দুইটী যন্ত্রের উন্নতি করা

আবশ্যক; কারণ ঐ দুইটীই কৃষির প্রধান যন্ত্র। কৃষি পরাশরে লাঙ্গলের যেরূপ বিধান আছে, তাহা পুনরায় প্রচলিত করার চেষ্টা করিলে ভাল হয়। ঈশ, মুড়া, নিজাম, ফাল ও যোয়াল এই পাঁচটী লাঙ্গলের প্রধান অঙ্গ। আরও কয়েকটী পদার্থ হল-সামগ্রী বলিয়া কথিত হয়। যথা; আঁকড়া, আঁকড় দড়ি, শৌল, পচ্চনী ইত্যাদি। শৌল শব্দে যোয়ালের উভয় পার্শ্বস্থ খিল বুঝায়। পচ্চনী, পাঁচনবাড়ি, আঁকড়া ও আঁকড়-দড়িকে পরাশর যথাক্রমে নির্যোল ও নির্যোলপাশিকা শব্দে উল্লেখ করিয়াছেন। কৃষিপরাশরে অষ্টবিধ হল সামগ্রীর পরিমাণও নির্দ্দিষ্ট হইয়াছে। যথা—

"পঞ্চ হস্তো ভবেদীশঃ স্থাণুঃ পঞ্চবিতস্তিকঃ।
সার্দ্ধ হস্তস্তু নির্যোলঃ যুগঃ কর্ণ সমানকঃ॥
নির্যোলঃ পাশিকা চৈব অড্ডচল্ল স্তথৈবচ।
দ্বাদশাঙ্গুলি মানোহি শৌলোঽবাত্নি প্রমাণকঃ॥
সার্দ্ধ দ্বাদশ মুষ্টির্বা কার্য্যা বা নব মুষ্টিকা।
দৃঢ়া পচ্চনিকা জ্ঞেয়া লৌহাগ্রা বংশসম্ভবা॥"

ঈশ পাঁচহাত, স্থাণু অর্থাৎ মুড়া পাঁচ বিঘৎ, নির্যোল দেড় হস্ত, যুগ অর্থাৎ যোয়াল এবং নির্যোল পাশিকা পা হইতে কর্ণ পর্য্যন্ত আয়ত, অড্ডচল্ল অর্থাৎ নিজেন দ্বাদশ অঙ্গুল, শৌল মুটম হাত, এবং পাঁচন সাড়ে বার মুষ্টি বা অভাব পক্ষে নয় মুষ্টি পরিমিত। পচ্চনীর একদিক লৌহময় ও অন্যদিক বংশময়।

তালের সারেই উৎকৃষ্ট ঈশ তৈয়ার হয়। মুড়া ও নিজেন বাবলা কাঠেই ভাল হয়। জেবল, লোনা ও বেলের সারে

দোয়াল তৈয়ার হয়। বেল, নিম, বল ও শিরীষের কাঠে উত্তম বিদের কাঠ তৈয়ার হয়। এখন অশ্বখ, বট ও অন্যান্য বন্য কাষ্ঠও ঐ সকল কার্য্যে ব্যবহার করা হইয়া থাকে। এদেশের মই সামান্য দুই খণ্ড বাঁশের দ্বারা নির্ম্মিত। ডেলা ভাঙ্গিতে ও মাটী সরাইতে ঐ মই সম্পূর্ণ উপযুক্ত নহে। পশ্চিম অঞ্চলে এক প্রকার কাঠের মই কৃষিকার্য্যে ব্যবহৃত হয়, তাহার উভয় পার্শ্বস্থ কাঠ দুই খানি প্রশস্ত ও স্থূল; তাহার দ্বারা উত্তমরূপে ডেলা চূর্ণ ও ভূমি সমান হয়। এ দেশেও সেইরূপ মই প্রচলিত হওয়া উচিত। কৃষি কার্য্যে ঐ রূপ লাঙ্গল ও মই ব্যবহার করিতে হইলে অগ্রে গবাদির উন্নতি করা আবশ্যক। অনেকে এদেশীয় কৃষিকার্য্যে বিলাতীয় যন্ত্রাদি ব্যবহার করিতে পরামর্শ দেন; কিন্তু উপরি উক্তরূপে দেশীয় যন্ত্রাদির কিছু পরিবর্ত্তন করিয়া লইলেই যথেষ্ট হয়। বিগত কয়েক বর্ষ হইতে প্রতি বৎসর বড় দিনের উৎসবে মান্দ্রাজের সিধাপথের আদর্শ কৃষি-ক্ষেত্রে বিলাতী ও দেশীয় লাঙ্গলের কার্য্যকারিতা পরীক্ষিত হয়; ঐ পরীক্ষায় বা হল-যুদ্ধে স্থিরীকৃত হইয়াছে যে, দেশীয় লাঙ্গলের কিঞ্চিৎ উন্নতি হইলে তদ্দ্বারা সকল দেশীয় লাঙ্গল অপেক্ষা উত্তম কাজ হয়। কেহ কেহ বঙ্গদেশীয় কৃষি যন্ত্রাদি পরিবর্ত্তনের প্রয়োজনও স্বীকার করেন না। তাঁহারা বলেন, সাধারণতঃ সমস্ত বঙ্গদেশীয় ভূমির উপরিভাগ পলিমাটী দ্বারা নির্ম্মিত। সুতরাং মাটীর সারাংশ উপরেই বিদ্যমান, তজ্জন্য অধিক খননের প্রয়োজন নাই; প্রচলিত লাঙ্গলাদি দ্বারা যেরূপ চাস হইয়া থাকে, তাহাই যথেষ্ট। কৃষিপরাশরে আরও দুই প্রকার হল সামগ্রীর নাম ও তাহাদের পরিমাণের নির্দ্দেশ

আছে। এখানে কেবল সেই সকল নাম মাত্রের উল্লেখ করা গেল। যথা আবদ্ধ অর্থাৎ আঁইদ;—ইহা যোয়ালের সঙ্গে আকড়াকে বদ্ধ করে, যোক্ত্র—যোত, রজ্জু, পাশিকা—সামী, বিন্ধক বিদে,—ইহাতে একুশটী লৌহশলাকা,—বিদে কাটি থাকার বিধি আছে; এবং মদিকা—মই। সর্ব্বশুদ্ধ পঞ্চদশ প্রকার হল-সামগ্রী। তন্মধ্যে বিদে, মই ও পাঁচন এই তিনটী মাত্র লাঙ্গল হইতে পৃথক, আর দ্বাদশটী লাঙ্গলের সহিত সংযুক্ত।

কৃষির যন্ত্রাদি সর্ব্বদা সকল স্থানে ক্রয় করিতে পাওয়া যায় না; প্রায়ই প্রয়োজন মতে প্রস্তুত করাইয়া লইতে হয়। কদাচ কোন হাট বা মেলায় উহা যথেষ্ট পরিমাণে আমদানী হইয়া থাকে। নদীয়া জিলার মধ্যে কাঁচড়াপাড়ার নিকটবর্ত্তী ঘোষপাড়ায় প্রতি বৎসর দোলের সময় যে মেলা হয়, তাহাতে ঐ সকল দ্রব্য ক্রয় করিতে পাওয়া যায়।

কৃষি কার্য্যের অবস্থানুসারে সকল কৃষকেরই ২।১ খানি গাড়ী রাখা আবশ্যক। ক্ষেত্র হইতে শস্যাদি গৃহে, খামারে কিম্বা বিক্রয়ার্থ হাট বাজারে লইয়া যাওয়া এবং ক্ষেত্রে সার দেওয়া, ক্ষেতে বেড়া বাঁধিবার জন্য স্থানান্তর হইতে কচা, কাঁটা ইত্যাদি আনাই গাড়ীর প্রধান প্রয়োজন। তদ্ভিন্ন যখন ক্ষেতে খামারে কাজ না থাকে, ঐ সকল গাড়ী, ভাড়া খাটিতে পারে। কৃষকের বাড়ী যদি কোন নগরের নিকটবর্ত্তী হয়, তাহা হইলে ঐ গাড়ী দ্বারা বেশ লাভ হইতে পারে। কৃষককে গাড়ী রাখিবার জন্য স্বতন্ত্র পশু পালন করিতে হয় না; চাসের গো, মহিষ দ্বারাই গাড়ীর কাজ চলিয়া থাকে।

# অষ্টাবিংশ পাঠ।

## পশু-পালন।

এদেশের কৃষি কার্য্যে গো ও মহিষ ভিন্ন অন্য কোন জন্তু গ্রহণ করা হয় না। তন্মধ্যে গোরুই প্রধান। কিন্তু অশ্ব, মেষ ও ছাগ এই তিনটী পশু-পালন করাও কৃষকের কর্ত্তব্য-মধ্যে নির্দ্দিষ্ট আছে। এদেশে কোন কৃষকই অশ্ব পালন করেন না। কিন্তু ইউরোপে গো, মহিষ ভিন্ন অশ্বও হল বহন করিয়া থাকে। মেষ ও ছাগাদির বিষ্ঠায় উত্তম সার হয়; বোধ হয়, কেবল তজ্জন্যই ঐ দুইটী পশু পালন করার বিধি আছে। কিন্তু গোগনের সহিত এক গৃহে ছাগ বন্ধন করা উচিত নহে। অন্যান্য দেশে হালিক পশুগণের প্রতি সেই সেই দেশীয় কৃষক ও ব্যক্তি সাধারণের বিশেষ দৃষ্টি আছে। যাহাতে ঐ পশুগণ হৃষ্ট, পুষ্ট ও সবল থাকে এবং যাহাতে কোন রূপে তাহাদের কষ্ট না হয়, সে বিষয়ে বাস্তবিকই লোকের দৃষ্টি থাকা আবশ্যক। কারণ পশুগণই কৃষির প্রধান উপকরণ।

এদেশীয় গোগণের ক্রমেই অধোনতি হইতেছে। ঐ অধো-নতির কয়েকটী কারণ দেখা যায়; তন্মধ্যে অতিরিক্ত পরিশ্রম, অপর্য্যাপ্ত আহার, অসম্পূর্ণ বিশ্রাম এবং উৎকৃষ্ট ষণ্ডের অভাব, এই কয়েকটীকে প্রধান বলিয়া বোধ হয়। গোগণের উন্নতি জন্য ঐ সকল দোষের সংশোধন করা আবশ্যক।

যে কৃষক দুইটী মাত্র গোরু রাখিয়া কৃষিকার্য্য করেন, পরাশর তাঁহাকে গো-খাদক বলিয়া গালি দিয়াছেন। তাহার কারণ, ঐ রূপ করিলে অতিরিক্ত পরিশ্রম করিয়া গোরু সকল

দুর্ব্বল ও শীঘ্র অকর্ম্মণ্য হইয়া যায়। এক খানি লাঙ্গলে যদি চারিটী গোরু রাখা যায়, তাহা হইলে প্রত্যেক গোরুর সম্ভব-মত পরিশ্রম করিলেই চলিতে পারে। কিন্তু অনেকেই সে রূপ হিসাব করিয়া চলেন না। যে সকল গোরুকে অধিক পরিশ্রম করিতে হয়, তাহারা যদি পর্য্যাপ্ত আহার পায়, তাহা হইলেও তাহাদিগের তাদৃশ ক্ষতি হয় না। কিন্তু এখন পশুগণের পর্য্যাপ্ত আহার পাইবার অনেক ব্যাঘাত আছে। পূর্ব্বে প্রায় প্রত্যেক গ্রামেই গোরু চরিবার জন্ম পৃথক্ ভূমি থাকিত। ঐ সকল ভূমিকে গোচর বা গোষ্ঠ কহে। এখন লোকসংখ্যার বৃদ্ধি সহকারে আবাদ বৃদ্ধি হওয়ায় গোষ্ঠ আর প্রায় দেখা যায় না। কিন্তু এখনও কৃষক কি জমিদারগণ মনোযোগী হইলে গ্রামের অবস্থানুসারে প্রতি গ্রামে ২।১টী গোষ্ঠ রাখা নিতান্ত কঠিন হয় না। মাঠের কাঁচা ঘাস, পশু-গণের পক্ষে অন্যান্য আহারীয় অপেক্ষা বিশেষ পুষ্টিকর। ঐ ঘাসের অভাব, এখনকার গো-জাতির অধঃপাতের একটী প্রধান কারণ, তাহার সন্দেহ নাই;

"শীতের ঘাস, বর্ষার পাশ।"

—শীত কালে গোগণকে উদর পূর্ণ করিয়া আহার দিতে এবং বর্ষাকালে উত্তম স্থানে রাখিতে হয়; নতুবা গোগণের বিশেষ অনিষ্টের সম্ভাবনা।

এখনকার কৃষকেরা প্রায়ই গোগণকে উত্তম রূপে রাখিতে পারেন না। যে কৃষকের গাভী, বৎস, বলদ ইত্যাদিতে এক শত আছে, তিনি সেই সমুদায়গুলিকেই

হয়ত একখানি সামান্য গোয়ালে রাখেন। ইহাতে এমন হয় যে, অধিকাংশ গোরু সমস্ত রাত্রির মধ্যে একবার শয়ন করিতে পায় না এবং যাহারা কথঞ্চিৎ শয়ন করিতে পায়, মল মূত্রে তাহাদিগেরও অর্দ্ধেক অঙ্গ পচিয়া যায়। যে সকল গোরু, অরুণোদয়ে লাঙ্গল চসিতে আরম্ভ করিয়া দুই কি আড়াই প্রহর পর্য্যন্ত কঠিন পরিশ্রমে নিযুক্ত থাকে, তাহারা যদি আবার রাত্রেও সম্পূর্ণ রূপ বিশ্রাম করিতে না পায়, তাহা হইলে কাজেই ক্রমে ক্রমে ঐ জাতির অধঃপাত হইয়া আইসে। বাস্তবিক তাহাই হইতেছে। অতএব যাহাতে গোগণ উপযুক্ত রূপ বিশ্রাম করিতে পায়, কৃষককে তদ্বিষয়ে মনোযোগী হওয়া আবশ্যক।

হিন্দু জাতির মধ্যে শ্রাদ্ধোপলক্ষে বৃষোৎসর্গের ব্যাপার সকলেই অবগত আছেন। একটী পুংবৎসের পশ্চাদ্ভাগের উভয় পার্শ্বে লোহিতোত্তপ্ত লৌহ দ্বারা ত্রিশূল ও চক্র চিহ্নে অঙ্কিত করিয়া ছাড়িয়া দেওয়া হয়। উহাতে কাহারও অধিকার থাকে না। সে সম্পূর্ণ স্বেচ্ছাচারের সহিত বিচরণ করে। এই জন্য তাহাকে সাধারণ গবাদির অপেক্ষা বিশেষ হৃষ্ট পুষ্ট দেখা যায়। যাঁহারা গোজাতিকে ভক্তি করিয়া থাকেন, তাঁহারা "ধর্ম্মের ষাঁড়" বলিয়া ঐ রূপ বৃষের প্রতি অধিক ভক্তি করেন। ঐ রূপ বৃষোৎসর্গের উদ্দেশ্য, যিনি যাহাই বলুন, গো জাতির উৎকর্ষ রক্ষা করাই উহার প্রধান উদ্দেশ্য বলিয়া বোধ হয়। বিশেষতঃ যে সকল গোরু লাঙ্গল কিম্বা গাড়ী টানে, তাহাদিগকে প্রায়ই মুষ্কহীন করা হয়; তাহাদিগের দ্বারা গো-বংশের উৎপত্তিরই কোন সম্ভাবনা থাকে না। সেই জন্য কতকগুলি

হৃষ্ট পুষ্ট বৃষ থাকা আবশ্যক বলিয়াই ঐ রূপে রাখা হইয়া থাকে। কিন্তু বর্ত্তমান কালে উহাদিগের প্রতি ভয়ানক অত্যাচার হইতেছে। গবর্ণমেন্টের অথবা স্থানবিশেষের মিউনিসিপালিটীর আদেশ অনুসারে উহাদিগকে প্রায়ই ময়লা ফেলার গাড়ীতে যোতা হইয়া থাকে, তদ্ব্যতীত শস্যহানি করে বলিয়া, অজ্ঞ কৃষকেরাও বৃষের প্রতি নিদারুণ নিষ্ঠুর ব্যবহার করে। এক কালে চারি খানি পা-ই ভাঙ্গিয়া দিয়াছে, বৃষ এক স্থানে পতিত থাকিয়া যন্ত্রণা ও অনাহারে মরিয়া গিয়াছে, কখন কখন এরূপ অশ্রোতব্য ঘটনারও প্রমাণ পাওয়া যায়। ইহা যে কৃষকগণের পক্ষে কতদূর অন্যায় কার্য্য, তাহা বলিয়া শেষ করা যায় না। বৃষগণ সমাজের, বিশেষতঃ কৃষকগণের অধিক হানিকর হইয়া উঠে তাহার সংশয় নাই; কিন্তু বৃষের উপকারিতা স্মরণ করিয়া উহার সকল অপরাধ মার্জ্জনা করা উচিত। ফলতঃ যাহাতে বৃষগণ ইচ্ছানুরূপ পান ভোজন করিয়া স্বচ্ছন্দে ও স্বাধীন ভাবে যেখানে সেখানে বিচরণ করিতে পারে, তদ্বিষয়ে সকলেরই দৃষ্টি রাখা কর্ত্তব্য। মহাদেবের বাহন বলিয়া বৃষের প্রতি আবার পুরাতনী ভক্তির উদ্দীপন আবশ্যক।

গোজাতি কেবল কৃষিকার্য্যেই উপকার করিয়া থাকে এমন নহে। যাবতীয় উৎকৃষ্ট ও পুষ্টিকর খাদ্যই গো হইতে প্রস্তুত হইয়া থাকে। এই সকল কারণেই গো জাতি হিন্দুগণের নিকট পূজনীয় হইয়াছে। দুগ্ধ, দধি, ঘৃত, ক্ষীর, ছানা ইত্যাদি কিরূপে প্রস্তুত করিতে হয় এবং উহাদিগের ব্যবসায়ে কিরূপ লাভ হয় বোধ করি, প্রায় সকলেই তাহা অবগত আছেন। যাহাহউক, এতাদৃশ উপকারী গো জাতির প্রতি

বর্ত্তমান কালে বড়ই অত্যাচার হইতেছে। এদেশে বিধর্ম্মি-রাজগণের শাসন প্রচলিত হওয়াবধিই গোজাতির ধ্বংস হইয়া আসিতেছে। এতদ্ব্যতীত সময়ে সময়ে দেশের সাময়িক গো মরক, বন্যা, ঝটিকাদি কারণে গোজাতির বিনাশ হইয়া থাকে। চর্ম্ম লাভের জন্য অনেক মুচিও বিষ প্রয়োগ দ্বারা গো হত্যা করিয়া থাকে। মান্দ্রাজ অঞ্চলে কোন কোন জাতি মাংস ভক্ষণের লোভে বিষ প্রয়োগ অথবা অঙ্গ বিশেষে অস্ত্র প্রয়োগ দ্বারা গোহত্যা করে। হিন্দুজাতির ধর্ম্ম শাস্ত্রে গোহত্যায় মহা পাপ নির্দ্দিষ্ট আছে; গোহত্যায় বাস্তবিকই মহা পাপ হইয়া থাকে।

কৃষি কার্য্যের উন্নতি হয়, এখন এ দেশের অনেকেই এরূপ ইচ্ছা করিয়া থাকেন। কিন্তু সর্ব্বাগ্রে তাঁহাদিগের গোজাতির উৎকর্ষ বিধানের চেষ্টা করা উচিত। গো জাতির প্রতি কোন রূপ অত্যাচার না হয়, ইহাই প্রথম দ্রষ্টব্য। কৃষিপরাশরে আত্মীয় ব্যক্তিকে গো সেবার্থ নিযুক্ত করিবে, এইরূপ বিধান আছে। এ বিধান অতি উৎকৃষ্ট, কারণ নিজে কিম্বা আত্মীয় দ্বারা গো সেবা পর্য্যবেক্ষণ না করিলে গোরুর প্রতি যত্ন হয় না। সাধারণের অনবধানে বহু কাল হইতে এ দেশীয় গো-বংসের হীনাবস্থা হইয়া আসিতেছে। এই দোষ সংশোধনের জন্য বিদেশ কিম্বা ভারতবর্ষের পার্ব্বতীয় অঞ্চল হইতে সবল ও বৃহৎকায় বৃষ আনিয়া পালন করা উচিত। ভারতবর্ষের অনেক বনে ও পার্ব্বতীয় দেশে গবয় বা চমরী নামে এক প্রকার গো-জাতীয় পশু বাস করে; তাহারা অতিশয় বলবান্ ও তেজস্বান্। তাহাদের সহিত বঙ্গদেশীয় গোজাতির সংস্রব ঘটাইবার চেষ্টা

করা উচিত। বিভিন্ন জাতীয় পশুগণের সংস্রবে যে সঙ্কর পশুর উৎপত্তি হয়, তাহারা স্বভাবতই বলবান্ ও কষ্টসহ হইয়া থাকে। এই জন্য গো, মহিষ, গবয় ইত্যাদির পরস্পর সংস্রব ঘটা প্রার্থনীয়। গোরু সবল হইলেই লাঙ্গল ও মইয়ের উৎকর্ষ হইবে এবং উৎকৃষ্ট রূপে ভূমির আবাদ হইয়া শস্য বৃদ্ধি হইবে।

---

# ঊনত্রিংশ পাঠ।

## গো-চিকিৎসা।

গো জাতির অনেক প্রকার সংক্রামক রোগ হইয়া থাকে; তন্মধ্যে কোন কোন রোগ সাংঘাতিক। যেমন খুরি, গুটি, পশ্চিমা ইত্যাদি। পশ্চিমা সকল রোগ অপেক্ষা সংক্রামক ও মারাত্মক। এদেশে যেখানে যত গোমরক হইয়া থাকে, ঐ সকল রোগই তাহার প্রধান কারণ। ঐ সকল রোগের প্রায় চিকিৎসা নাই। তবে যথা সময়ে উপযুক্ত যত্ন করিতে পারিলে একেবারেই যে, কৃতকার্য্য হওয়া যায় না, তাহাও নহে। অন্ততঃ কিয়ৎ পরিমাণে রোগের বৃদ্ধি ও সংক্রমণ নিবারণ করা যাইতে পারে। বিলাতে এ বিষয়ে বিশেষ নিয়ম আছে। কোন কৃষকের পালে ঐ সকল সংক্রামক ও মারাত্মক রোগ উপস্থিত হইলে, সে, আইন অনুসারে পুলিসে সম্বাদ দিতে বাধ্য। পুলিস সম্বাদ পাইয়া পীড়িত গো সকলকে স্থানান্তরিত করিয়া দেন বা বধ করিয়া ফেলেন। নিকটবর্ত্তী কৃষকদিগকে ঐ

পালের সহিত আপন আপন গোরু চরাইতে নিষেধ করিয়া দেন। ভিন্ন দেশ হইতে বিলাতে গোরুর আমদানি হইলে, সেই সকল গোরুকে কিছুদিনের জন্য কোন নির্দ্দিষ্ট স্থানে রাখিয়া পরে তাহাদিগকে অন্যান্য গোরুর সহিত চরিতে দেওয়া হয়। পীড়িত গোরুর সহিত সংস্রব নিবারণ, ঐ সকল রোগে মৃত গোরু, ২।৩ হাত মাটীর নীচে পুতিয়া ফেলা, পীড়িত গোরু স্থানান্তরিত করিয়া তাহার গোয়ালের মৃত্তিকা কিয়ৎ পরিমাণে তুলিয়া ফেলিয়া তাহার মেজে ও দেওয়াল হীরাকস মিশ্রিত জলে ধৌত করা, সেই গোয়ালের আবর্জ্জনা দগ্ধ করিয়া ফেলা ইত্যাদি অনুষ্ঠানগুলি, গোমরক নিবারণ জন্য অনায়াসে করা যাইতে পারে; কিন্তু বিলাতের অনুকরণে পীড়িত গোরু বধ করিয়া ফেলা হিন্দুর দেশে কথনই চলিতে পারে না। খুরি রোগাক্রান্ত গোরুকে জলে বাঁধিয়া রাখা, তাহার ঘায়ের পোকা বাছিয়া দেওয়া, যাহাতে ঘায়ে মাছি বসিতে না পারে, তাহার উপায় বিধান প্রভৃতি যে সকল চিকিৎসা এ দেশে প্রচলিত আছে, তাহাই যথেষ্ট। তবে গোমরক নিবারণ জন্য যত খানি সাবধান হওয়া উচিত, এ দেশীয় কৃষকগণ সেরূপ হন না। তজ্জন্য কৃষিবিভাগীয় কর্ত্তৃপক্ষগণ বিশেষ মনোযোগী হইলে ভাল হয়।

তবে ভরসা এই যে, যখন সেরূপ কাল উপস্থিত হয়,—যখন যে কার্য্য সাধনের প্রয়োজন হয়, তখন স্বতঃই তদনুরূপ আয়োজন হইয়া আইসে। এখন কৃষির প্রতি উচ্চশ্রেণীস্থ লোকের একটু দৃষ্টি পতিত হইয়াছে; সুতরাং কৃষির উন্নতির অনেক আয়োজনের সম্বাদ চারি দিক হইতে পাওয়া যাইতেছে।

কিছুদিন পূর্ব্ব হইতেই লাহোর, পুনা ও মান্দ্রাজে পশুচিকিৎসার এক একটী স্কুল খোলা হইয়াছে। কলিকাতাতেও হইবার প্রস্তাব হইয়াছিল; কিন্তু এ পর্য্যন্ত কার্য্যে পরিণত হয় নাই। সম্প্রতি রায় বদ্রি দাস বাহাদুর স্বয়ং বোম্বাইয়ের পশু চিকিৎসালয়ের কার্য্য প্রণালী স্বচক্ষে দর্শন করিয়া কলিকাতায় তদনুরূপ একটী পশু-চিকিৎসালয় স্থাপনে উদ্যোগী হইয়াছেন। তাঁহার নাম দেখিয়া অনেকে অর্থ সাহায্য করিতে প্রতিশ্রুত হইয়াছেন। এই সকল কার্য্যে বঙ্গদেশীয় গবর্ণমেণ্ট্ যদি একটু বাতাস দেন, তাহা হইলে সোণায় সোহাগা হয়। যাহা হউক, কৃষি বিষয়ে দেশের কিঞ্চিৎ সুলক্ষণ দেখা যাইতেছে।

উপরি উক্ত প্রকার সংক্রামক রোগ ব্যতীত আর এক প্রকারে গোরুর অনিষ্ট হইয়া থাকে। তাহা গোরুর অপঘাত মৃত্যু। মনুষ্য দ্বারা অপঘাত মৃত্যুর কথা পূর্ব্বে বলা হইয়াছে। ব্যাঘ্র, সর্প প্রভৃতি দ্বারাও অনেক গোহত্যা হইয়া থাকে। মেষ, ছাগ, গো, এই সকলের মধ্যে গোরুর অপঘাত মৃত্যুই অধিক হয়। ১৮৮৪ খৃষ্টাব্দের গবর্ণমেণ্টের রিপোর্ট পাঠে জানা গিয়াছে, যে ঐ বৎসর ৫০ হাজার গো মহিষের অপঘাত মৃত্যু হইয়াছিল। তন্মধ্যে গোরুর সংখ্যা অধিক। আবার অন্যান্য কারণে মৃত্যু অপেক্ষা ব্যাঘ্র দ্বারা গো হত্যাই অধিক। এ উৎপাত নিবারণ কল্পেও দেশীয় গবর্ণমেণ্টের মনোযোগ প্রার্থনীয়।

## ত্রিংশ পাঠ।

### এক লাঙ্গলের আবাদ, খরচ উৎপন্ন ও লাভ।

বর্ত্তমান কালে চাকরির দুর্দ্দশা দেখিয়া অনেকের ইচ্ছা হইয়াছে হয় কৃষি, নয় বাণিজ্য অবলম্বন করেন। বাণিজ্যে অধিক মূলধনের প্রয়োজন হয় বলিয়া তাহা অনেকের পক্ষে দুর্ঘট। কৃষি কার্য্যে অপেক্ষাকৃত অল্প মূলধন লাগিলেও তদ্বিষয়ক অভিজ্ঞতার অভাবে কেহই তাহাতে প্রবৃত্ত হইতে পারেন না। "লাঙ্গল করার" ইচ্ছা হয়, কিন্তু চাসের ফল হঠাৎ দেখিতে না পাওয়ায় কাহারই তদ্বিষয়ে সাহস হয় না। তাঁহাদিগকে প্রচলিত কৃষি প্রণালীতে একখানি লাঙ্গলের ফলাফল বিষয়ে, কিয়ৎ পরিমাণে, আভাস দিবার জন্য পরবর্ত্তী হিসাবটী সংগ্রহ করিয়াছি।

---

সম্পূর্ণ।

| | | | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ছোলা | ৩/ | ২৲ | ০ | ০ | ॥০ | ০ | ১।০ | | ৬ |
| মটর | ২/ | ২৲ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১৲ | ৲ | ২৲ |
| মসিনা | ৪/ | ১।০ | ০ | ০ | ০ | ০ | ১।০ | ০ | [illegible] |
| | ৪/ | ১২৮॥১০ | ৩০৸৵০ | ১০।০ | ১৪৸০ | ১১৲ | ২২।৴১০ | ২৯৲ | |

এক লাঙ্গলের গোরু

| | |
|---|---|
| চারিটার মূল্য | ১০০৲ |
| কৃষাণের বার্ষিক বেতন | ৪৫৲ |
| রাখালের বার্ষিক বেতন | ৩০৲ |
| | ২৯৩॥১০ |

ছোলা, মটর, মসিনা ও অরহরের জন্য পৃথক্ জমির প্রয়োজন হয় না, যে জমিতে আউশ ধান ও পাট হয়, সেই জমিতেই ঐ সকল ফসল হইতে পারে। এইজন্য উক্ত ফসল সকলের, মোট জমি ১০ বিঘা বাদ দিলে ৩০ বিঘা অবশিষ্ট থাকে। অতএব এক লাঙ্গলে যত জমির আবাদ হয় তাহার প্রকৃত পরিমাণ ৩০ বিঘা।

## এক লাঙ্গলের উৎপন্ন ও লাভ।

| জিনিষ | জমির পরিমাণ | উৎপন্ন | দর ফিঃমণ | দর ফিঃবিশ | মোট টাকা | বাদ খরচ | মোট লাভ |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| আশু ধান্য | ১০/ | ১১/ | ৹ | ২॥০ | ৬২॥০ | ২৩৲ | ২৯৷ |
| আমন ধান্য | ১০/ | ১১/ | ৹ | ২॥০ | ৬২॥০ | ২০৲ | ৪২॥ |
| হরিদ্রা | ১/ | ১৫/ | ৫৲ | ০ | ৭৫৲ | ২০।০ | ৫৪৸ |
| ইক্ষু | ॥০ | ৪/ | ৬৲ | ০ | ২৪৲ | ১৬।৵০ | ৭॥৵০ |
| লঙ্কা | ।০ | ৩/ | ৫৲ | ০ | ১৫৲ | ৩৲ | ১২৲ |
| পাট | ২/ | ১০/ | ২॥০ | ০ | ২৫৲ | ৮৲ | ১৭৲ |
| অরহর | ১/ | ৩/ | ১॥০ | ০ | ৭॥০ | ৶১০ | ৪।/১০ |
| তামাক | ২/ | ২ ছালা | ২৫ ফিঃছালা | ০ | ৫০৲ | ১৬॥০ | ৩৩॥০ |
| সর্ষপ | ৪/ | ৮/ | ৩৲ | ০ | ২৪৲ | ৬৲ | ১৮৲ |
| ছোলা | ৩/ | ৯/ | ১॥০ | ০ | ১৩॥ | ২৲ | ১১॥ |
| মটর | ২/ | ১২/ | ১।০ | ০ | ১৫৲ | ২৲ | ১৩৲ |
| মসিনা | ৪/ | ৬/ | ৩৲ | ০ | ১৮৲ | ১।০ | ১৬৸০ |
| | ৪০/ | | | | ৩৮৯৲ | ১.৮॥১০ | ২৭০।৴০ |

এই লাভ হইতে গোরুর মূল্য এবং কৃষাণ ও রাখালের বেতন জন্য আরও ১৭৫৲ টাকা বাদ দিতে হইবে, তাহাতে প্রথম বর্ষের প্রকৃত লাভ ৯৫৲ টাকা; কিন্তু অন্যান্য বর্ষে গোরুর টাকা বাদ যাইবে না। সুতরাং এক লাঙ্গলে বার্ষিক প্রায় দুইশত টাকা লাভ থাকিতে পারে। বিবেচনা ও অভিনিবেশ পূর্ব্বক চাস করিতে পারিলে এক লাঙ্গলে ইহা অপেক্ষা বেশি হইবারই সম্ভাবনা।

# এক লাঙ্গলের আবাদ ও খরচ।

| জিনিস | জমি | একুন খরচ | ভূমির খাজানা | নিড়ানি ইত্যাদি | কাটাই ইত্যাদি | মাড়াই | রোপন | বীজ | তৈয়ারি পাইট | বীজ-পরিমাণ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| আশু ধান্য | ১০/ | ২৩৲ | ১০৲ | ৫৲ | ৫৲ | | ০ | ৩৲ | ০ | ৫১৫ |
| আমন ধান্য | ঐ | ২০৲ | ঐ | ১৲ | ২॥০ | | ৫৲ | ১॥০ | ০ | ৫৭॥ |
| হরিদ্রা | ১/ | ২০।০ | ।০ | ২৲ | ঐ | | ১॥০ | ১০৲ | ৩৲ | ১০/ |
| ইক্ষু | ॥০ | ১৬।৵০ | ॥৵০ | ০ | ১।০ | | ২৲ | ২॥০ | ১০৲ | ২॥০ |
| লঙ্কা | ॥০ | ৩৲ | ॥০ | ॥০ | ০ | | ॥০ | ০ | ১॥০ | ৫১০পালী |
| পাট | ২/ | ৮৲ | ২৲ | ২৲ | ০ | | ০ | ॥০ | ৩॥১ | ৫১০ |
| অরহর | ২/ | ৶১০ | ০ | ০ | ০ | | ০ | ৶১০ | ০ | ।০ |

## হৈমন্তিক।

| জিনিস | জমি | একুন খরচ | ভূমির খাজানা | নিড়ানি ইত্যাদি | কাটাই ইত্যাদি | মাড়াই | রোপন | বীজ | তৈয়ারি পাইট | বীজ-পরিমাণ |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| তামাক | ২/ | ১৬॥০ | ২॥০ | ০ | ২৲ | | ২৲ | ০ | ১০৲ | |
| সর্ষপ | ৪/ | ৬৲ | ৪৲ | ০ | ১৲ | | ০ | ১৲ | ০ | ১। |